মধ্যে ক্রমশঃ একটা শতবর্ষব্যাপীকালের মুর্শিদাবাদের মত সমস্ত বাণিজ্যগৌরব নিয়ে অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ যুগে East and Westএর অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হ'ক বা না হ'ক, সে আমাদের বড় চিন্তা নয়। এণ্ড্রুজ সাহেব সেতার বাজান কিনা আর রবিবাবু হারমনিয়ম বাজান কিনা সেটা এযুগের বড় স্মরণীয় ঘটনা নয়। আমাদের চিন্তা এই, আমাদের জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্যের আরাধনা অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় শিল্পগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা—মানুষকে শুধু 'lever of art হ'লে চল্‌বে না, 'art of living'ও শিখতে হবে। বাঁচার মত বেঁচে থাকতে হ'লে জীবনের মাঝে সৌন্দর্য্যের সাধনা চাই। মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে শিখ্‌লে, তার অপর কোন শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা জানিনা।

আমাদের জীবিতকালে যে কর্ম্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে যেতে হবে তা পূর্ণ করতে যুগযুগের সঞ্চিত বিশাল চিন্তা, অসম্ভব স্বপ্ন ও বিজ্ঞের উপেক্ষিত Sentimentalism নিয়ে বহু artist বহু শিল্পী চাই; সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ভারতীয় কল্পনা সৌন্দর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের এই নূতন সাধনা, নূতন চিন্তা, নূতন স্বপ্নসৃষ্টির অন্তরালে যে আদর্শ নিয়ে কর্ম্মমন্দির রচিত হবে, কত যুগযুগান্ত পরে ঐ কল্পনার সৌন্দর্য্য নব নব আদর্শে রূপান্তরিত হয়ে শত শত অজন্তা, সহস্র সহস্র তাজমহল, লক্ষ লক্ষ সাধক-শিল্পী ভারতবর্ষে আকার গড়ে তুলবে। ভারতবর্ষ সেদিন আবার যথার্থ সৌন্দর্য্যের সাধক হয়ে "সোনার ভারত" বলে জগদ্বিদিত হবে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]　　　　[অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল।

ভারতের আহ্বান

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

ভারতের যে বাণী—সে বাণী সমস্ত পৃথিবীর। ভারতে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তারা সে বাণী পৃথিবীর মধ্যে প্রচার করবে—তার জন্য ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা করছে, তার জন্য যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে। তারি জন্য বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে পাবে কিঁ না পাবে সকলে আজ ছুটে আসছে। আমাকে ভারতের ইতিহাস ডেকেছে। যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে—সে শঙ্খধ্বনি তোমার প্রাণকে স্পর্শ করেছে, তাই তুমি ছুটে এসেছ। আমি কেহ নই। আমি কে? আজ আমি সামান্য কর্ম্মীমাত্র—তোমাদের সেবক,—তার বেশী অহঙ্কার আমার নাই। তোমাদের সেবায়—আমার স্বদেশবাসীর সেবায়—আমি আজ কর্ম্মে নিযুক্ত। কাল হয়ত ভগবৎ কৃপায়—এমন অবস্থা হবে——আমি আর সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে পারবো না। আমাকে এখনই হয়ত তিনি অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে নেবেন; নয়ত আমাকে মরণের দেশে যেতে হবে।

এই যুগধ্বনি তোমাদের প্রাণে বেজেছে! একবার ধ্যান কর—একবার চোখ বুজে মনের মধ্যে চক্ষুকে তাড়িত কর—দৃষ্টিকে পাতিত কর, তখন দেখতে পাবে কি? দেখতে পাবে শুন্‌তে পাবে কি? যা দেখবে তাই শুনতেও পাবে। মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আলোক ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে—সেটা দেখবার জিনিষ—সেটা শুনবার জিনিষ—সেটা বুঝবার জিনিষ।

ইন্দ্রিয়ের ভোগ সেখানে নাই। সেখানে তোমাদের দেখা, শোনা, আস্বাদ-করা, পান করা সব এক কথা। সেখানে এই পঞ্চেন্দ্রিয় এক,—একই আধার সে কি? মুক্তি। সে কি? ধ্যান। সে সব—সে সন্ধ্যার মন্ত্র, জীবনের সব। সেটা দেখতে হবে, দেখতেই হবে, কেউ কারো ছেড়ে নয়। আজ যে ঘৃণা করে, মানুষকে বঞ্চিত করে বলে সব বাতুল—কাল তাকেও আসতে হবে। যুগ শঙ্খ বেজেছে। এযুগে ভারতে এমন নরনারী থাকতে পারে না যে বিধাতার যুগশঙ্খ ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করবে। তাকে শুন্‌তেঃহবে—আজ না হয় কাল। লীলাময়ের সময়ের ত অন্ত নাই। আজ না হয় দু'দিন পরে শুন্‌তে হবে—দেখতে হবে ওরূপ দেখতে হবে! মনকে বাঁধতে হবে, মনের সেতার ঐ সুরে বাঁধতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এই যে প্রেমের বন্যা—এতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কে ছুটবে বল। যদি আমি প্রাণ দিতে পারি-কে ছুটবে বল। বিশ্ব আর তাকে কি আবদ্ধ করতে পারবে। বিধাতা যদি সে প্রেম আমার হৃদয়ে দেন, আমি যদি সে প্রেম ঢেলে দিতে পারি, যতই যুক্তি কর, তর্ককর—থাকতে পারবেনা। পথে বেরুতে হবে। দেখতে পারছনা ভগবানের দুই বাহু সমস্ত দেশকে ঘিরে রেখেছে। দেখতে পারছনা?—চোখ খোল—অন্ধের মত থেকনা! ধ্যানে শুনতে পাওনা? দৃষ্টিহীন, সাধনাবিহীন চোখ বুঝে ভগবানের কৃপাভিক্ষা কর। দিনের পর দিন যুক্তি তর্কের মধ্যে বদ্ধ-জীবের মত আবদ্ধ থেকনা। মনটিকে খুলে দাও—আকাশ বাতাসের স্পর্শ নেও। সাধনাতে স্পর্শ কর। দেখবে সব বন্ধন টুটে যাবে। একথা আমি অহঙ্কার করে বলছিনা। আমার কিছুই নাই। ভগবৎ প্রসাদে একথা বলবার অধিকার ভগবানই আমাকে দিয়েছেন। আমার আর বাহ্যিক কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই।

যে স্বাধীনতার বাণী ভগবৎ কৃপায় আমি শুনেছি—তাতে নিজকে স্বাধীন করেছি—আমার স্বরাজ আমি পেয়েছি। ভাইরে; মনে করোনা আমি অহঙ্কার করে বলছি। যদি অহঙ্কার করে বলি—তবে আমার মাথা তোমার পায়ে ছোঁয়াই। আমি অবনত মস্তকে তোমার পায়ের স্পর্শ নেব।

আজ আমার মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে সেইটাই আমি বলছি। ইচ্ছা করে আমার সমস্ত ভাইদের দুই হাত আমার বুকের উপর রেখে সেই অনুভূতি তাদের দিই। সত্য মিথ্যার কথা বলছি না। আমি স্বরাজ পেয়েছি—আমার ভাবনা নাই—ভয় নাই। আমি যতদিন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে এই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা বাংলার সমস্ত নর-নারীর হৃদয়ে জাগাতে না পারি ততদিন,—আমার বিশ্রাম নাই—আমার বিরাম নাই। এ কাজ করতে হবে। যদি আমি অক্ষম হই—বিধাতার ইচ্ছায় যদি আমার চেয়ে আর কেহ বেশী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, আমি সরে যাব। আমি মাটিতে শুয়ে থেকে ধুলায় লুণ্ঠিত হব। কিন্তু ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে চরণ স্পর্শ করে যতদিন পর্য্যন্ত না এই স্বরাজের স্বাধীনতার বার্ত্তা দেশে আমার ভাই বোনদের মনে না জাগাতে পারব ততদিন আমার বিরাম নাই।

শিক্ষার বিরোধ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে চলে আস্‌ছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিলনা। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা' আমিও পড়্‌ব। এর থেকে তিঁনিও যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বস্‌তে পেয়েছেন, হ্যাণ্ড-শেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই না কোন পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি! হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল! কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ সমেত এম্‌নি টলমল কর্‌তে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়েই গেল দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এম্‌নি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এতো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাট্‌তে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিচালিত একখানা Anglo Indian কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলচে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙে ফেলেচি, ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—And if there were any among educated Bengalees who were wavering and vacillating, knowing not what to do—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on the-fence posture. They have jumped off on the Western side. অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিমপ্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয়রাম'! বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হ'ল! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা' নিয়ে এত বড় রই-রাই করেন, যাদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি তর্কে এর কি মুল্য দাঁড়ায় একবার সেটাওত ওজন করা ভাল! কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েচে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞেসা করছে 'ভারতের বাণী কই'?' অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগ পন্থীর কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না।

তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং, অতএব মাগৃধঃ। চমৎকার কথা,—কারও কোন দ্বন্দ্ব নেই। এযে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ায় এও কেউ লোক সমাজে স্বীকার করে না। অথচ, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব যে সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মত, তার মধ্যে অসংখ্য sub clause, অগণিত qualificationএর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসঙ্কোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত fact গুলোই সংসারে সত্যের মুখোস পরে মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেচেন, "এ কথা মান্‌তেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। ....অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোর।"

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীর ভাণ্ডেই যে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বয়ে দুধের ধারা নেমেছে,—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই না বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এ কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চই একটা সত্যের জোরে! এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে! লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এক একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে জলের উপর এবং ঊর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে সে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না কিসে এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে

তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁট-কাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি কোরে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মান্‌তেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেচে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাইই এ কথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করে নি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকে নি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের পাত্রও ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়ে নি কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশা খেলা শিখেই কাটাতে হোতো। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফ্‌গানের কাছে শেখ্‌বার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেচে সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেচে তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমে বিদ্যে। শেখ্‌বার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেচে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভাণ করার ওপর। শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে

বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেচে—এই ত দেখি আসলে মত ভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশেষ করে দেখ্‌বার চেষ্টা করা যাক্। পশ্চিমের পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময় এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভ'রে উঠেচে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বা'র করেচে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছু দিন অগ্রসর হ'লে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটীমাত্র মাপকাঠি কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটেই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখ্‌তে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শিখাতে পারে কিম্বা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয় নি? হয়েছে বই কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-productএর মত। বলা যেতে পারে, হ'ক by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ব ক'রেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে এগুলো দেখতে শুন্‌তে মানুষের মত হ'লেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলে মানুষ। বেল্‌জিয়ম্ যখন রবারের জন্য নিগ্রোদের দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত তখনও এই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে এরা আমাদের হুকুম মান্‌তে চায় না। এরা অসভ্য! অতএব আমরা গায়ে প'ড়ে এদের সুসভ্য কর্‌বার মানুষ কর্‌বার ভার যখন নিয়েছি তখন মানুষ এদের কর্‌তেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্যে এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। অবশ্য তথাস্তু বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠ্‌লেও ইংরাজ ঠিক এই

জবাবটাই দিয়ে আসচে যে এরা অর্দ্ধ সভ্য—ছেলে মানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকা কড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে সমস্তও দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করচেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হ'য়ে এদের মানুষ কর্‌তে এসেছি;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে কিন্তু আঃ—গেলাম! by law established হ'য়ে এই ইণ্ডিয়ান গুলোকে মানুষ কর্‌তে কর্‌তেই হয়রান হয়ে মোলাম।

ভগবান জানেন্‌ কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা মুক্ত কর্‌তে পার্‌ব! দেড়শ বছর ধরে তালিম দেওয়া চল্‌ছে কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হ'তে পার্‌ব সেও ওঁরাই জানেন আর জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু ঐ দেড়শ বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে যে এদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠ্‌ব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে, নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলিয়া দিতে এরা ব্যাকুল, তা, হলে আমি বলি আমাদের কোন কালে মানুষ না হওয়াই উচিত! ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন।

বস্তুতঃ, একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও কর্‌তে পারে? তার বিদ্যালয় তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় কর্‌তে উকীল মোক্তার মুনসেফ; হুকুম মতে জেলে দিতে ডেপুটি সবডেপুটি; ধ'রে আন্‌তে থানার ছোট বড় পিয়াদা; ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মাষ্টার; কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্ব্বরতার লেক্‌চার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসের খাতা লিখিতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী,—তার শিক্ষা বিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা কর্‌তে পারে সে যে পারে না

কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিম্বা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল, শুক্রাচার্য্যের হাতে আজ তাঁর বাড়ী পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হ'তে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়তেই হবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অমৃত-লোকের লোক হ'য়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্য্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস্‌ আছে যা' তার অদৃষ্ট। যে বস্তু তার দৃষ্টির বাইরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেম্‌নি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা' তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট-বস্তুও অনেকটা দায়ী। যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

মনে কর এক বাপের দুই ছেলে! বাপ স্বয়ং মটর হাকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতুহলের অন্ত নেই! সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালক ছেলেটি মোটরের কল কারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধস্বরে বাশি বাজিয়ে দৌড় মারলে গাড়ী চালাবার সখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে বাপ আছেন কি নেই সে হুঁস তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়ীটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং

যে রথের রথী ছেলেও যে সেই রথের রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ড ভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রাখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং—তখনও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা' বোঝা যায় না। তবে একথা বেশ বোঝা যায় এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে, তা' তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন্ তার মরণং ধ্রুবং।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মটর-হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাশে প্রোমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির মরণং ধ্রুবং সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র মন্ত্রের পরে কঠোর কটাক্ষে কবি পূর্ব্বেও করেছেন। তাঁর অচলায়তনে এ নিয়ে হাসি-তামাসা অনেক হয়ে গেছে, যারা ওয়াকিফ-হাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ব বস্তুর পিছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তত্ত্ব। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কুল কিনারা তার তেম্‌নি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আস্‌চে,—আজও তার উপায় বার হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিক অর্থাৎ মন্ত্র তন্ত্রে, এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনার চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, এই মটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা—"পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকৃচি দৈন্য হলে গ্রহ শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে

দৌড়াচ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলাদেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'শুনেচি নাকি মন্ত্র গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভালটেয়ার জবাব দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোন কোণে কানাচে যাদু মন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তা'হলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? ভলটেয়ার বেশি দিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সেদেশেও বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্ব্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে ঠিক এম্‌নি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিলনা? কেউ ছিলনা যে বলে, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ী যাও? মারতে চাওত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ মন্ত্র জপ করলেই কার্য্য সিদ্ধ হবেনা? য়ুরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্বা যে হাতী দঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ উচ্চাটন মন্ত্রতন্ত্রের ইঙ্গিতেও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে! 'গোরা' বলে বাঙলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে'

কবি বলেছেন, যাদুমন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞান। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে য়ুরোপ তার যাদু বিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা দেশ সুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড়-ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুতে রইলাম! বাইরের দিকে বস্তুবিশ্ব যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড, অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে

যাদু বিদ্যায় ভাঙেনা, সংসারে যা-কিছু ঘটে—তারই একটা হেতু আছে এবং সেই হেতু কঠোর আইন কানুনে বাধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব জগতে কার্য্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্ব্বদেশে কারও ছিলনা? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হ'তে আমদানী না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশী আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিস্তার অনেক গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে ত মনে হয় লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ তাদের মানুষের ধারণা যা, তা তারা আমাদের দেয় নি দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেরও যে আমরা কি হয়ে আছি মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবলই এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব্ব বিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের গভীর। সেটা জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজ-সজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে। তাই একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্ব্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত না হতে পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই! ওদের জাতিভেদ নেই অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হ'লেই নয়, তাদের খাওয়া দাওয়া বাচ-বিচার নেই সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষে নেই, তাদের মন্দির নেই, অতএব আমাদেরও গির্জ্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া ক'রে ধর্ম্মপ্রচারক রাখে সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুজে পান নি, নইলে আজ তাঁদের চেনাও যেত না। অথচ, আমি এর দোষ গুণের বিচার করচি নে, আমি সরল চিত্তে বলছি, কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এর Mentalityটাই আপনাদের

গোচর করবার প্রয়াস করচি। এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের আনন্দের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যারা এসেছিলেন তাদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটেনি যে বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে কেবল সেই টুকুর হুবহু নকল করলেই তাঁরাও অমনি মানুষ হ'য়ে ওদের অন্দরে পংক্তিভোজনে সরাসর বসে খেতে পাবেন। সংসারে যা কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না—একথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে নি যে মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্ত্রটা কেবল ওদের ওই নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটীতেই চাপা দেওয়া আছে, কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলেছে—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অত বড় বড় বাড়ী কি হবে? কি হ'বে টানা পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতি প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হ'য়ে গেল! এমনি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটাকতক সাজ গোজ বদলালেই হ'বে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেক্ট্রীক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফে-সারের বদলে রোগা মাইনের দিশি অধ্যাপক আমদানী ক'রে কিম্বা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলে দুঃখ দূর হ'বে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না যতক্ষণ সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হ'তে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হ'লেও সে শুধু একটা গোঁজা মিল হ'বে,—তাতে কল্যাণ

নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবেনা।

অভয় মন্ত্র

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

লহ লহ লহ
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ,
দিবসের কর্ম্মে তোর সারাদিনমান
যতেক সংসার ভয় ছায়ার সমান
অনুক্ষণ চলে পিছে পিছে,
যাক্ আজি যাক্ তাহা ঘুচে ;
লহ লহ লহ,
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ।
ঘৃণা, লাজ, ভয়
নিমিষে হইবে সব ক্ষয়।
এ মন্ত্র জপিতে হবে সর্ব্বক্ষণ ধরি,,
এ মন্ত্রে জীবন ভরে নিতে হবে বরি,
এ মন্ত্র আশ্রয়
জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মে ছুটে যাবি নাহি কোন ভয়।
ঘৃণা, লাজ, ভয়!
কার ঘৃণা? কিসে লাজ? কারে তোর ভয়?
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছতম ভয় করি তারে
অপমান করিস্‌না তাঁরে,
অন্তরে তোমার যিনি সর্ব্বক্ষণ ধরি
জাগিছেন অভয় বিতরি।

তাঁরি বলে বলীয়ান্ সত্য পথে ছুটে যেতে হবে,
মহাবীর কে তোরে রোধিবে?
রোধিবে ঝঞ্ঝার বেগ ক্ষুদ্র পঙ্গপাল,
শুষ্ক তৃণরাশির জঞ্জাল?
বিদ্যুতে করিবে রোধ চাতকের পাখা?
শুষ্ক পর্ণ ঢাকা দিবে যজ্ঞানলশিখা?
দীক্ষিত অভয় মন্ত্রে চলেছ নির্ভীক্,
মহাসত্যে স্থিরমতি, সত্য পথে হে বীর পথিক,
তদেক শরণ—
শঙ্কা নাহি আসিলে মরণ।
তিনি ছাড়া আর
বিরাট এ বিশ্বে তোর ভয় করিবার
নাহি নাহি নাহি অধিকার।
হে অভয় মন্ত্র আজ জাগো,
ভারতের প্রাণে প্রাণে জাগো!
ভারতের গৃহে গৃহে, বুকে বুকে লভ যজ্ঞবেদী—
তা'রপরে রহ সমুজ্জ্বল
নিত্যকাল হে অভয় মন্ত্রের অনল।
তব উচ্চারণ
সর্ব্বক্ষণ তোমায় স্মরণ
মুহূর্ত্তে করুক দূর যত মিথ্যাভয়
অলীক সংশয়।
দুর্ব্বলের কাণে কাণে কহ অবিরাম
"এ সংসারে ভয় করিবার
তিনি ছাড়া আর,
নাহি নাহি তোর অধিকার।"

ভাঙ্গন ও গড়ন

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস]

সৃষ্টির সুন্দর প্রকটন হয় ধ্বংসে। নতুন যুগের আরম্ভ হয় প্রলয়ের পশ্চাতে। পুরাতনের আগাগোড়া ভাঙ্গনের উপরেই নতুনের লীলাভবন গড়ে উঠে। কারণ বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্বলীলার এও একটা বিশেষ অঙ্গ যে যেখানে পুরাতনের কাঁটা বনে ঝোপে ঝাপে জঙ্গলে প্রাণসঞ্জীবনী আলোক বাতাস বন্ধ হয়ে যায় সেখানেই সে কাঁটার বাঁধন সে বনের আড়াল ভাঙ্গবার প্রয়োজন সবার আগে। এ শুধু যে বাহিরের সৃষ্টির বিষয়ে সত্যি তা নয়, এ অন্তরের সৃষ্টির পক্ষে আরও বেশী করেই প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন পুরাণো ইমারত ভেঙ্গে তবে নতুন প্রাসাদ গড়তে হয়, তেমনি পুরাণো ভাবধারার জীর্ণ সরঞ্জামগুলি একবারে অপসারিত করে তার উপর গড়ে তুলতে হয় নতুনের সাধনভূমি। কারণ সবটাতেই মুক্তক্ষেত্র চাই, তবে নতুন সৃষ্টির পত্তন করা সম্ভব। বিশ্বজোড়াই এ ভাঙ্গন গড়নের খেলা চলছে, যেহেতু এ খেলায় স্বভাবের অনুমোদন আছে এবং সে অনুমোদন আছে বলেই এ লীলা তরঙ্গের উপর ভর দিয়ে প্রকৃতিরাণী তাঁর নতুন নতুন বিহারভূমি গড়ে তুলছেন। সব খানেই এ রকম ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লীলাময়ের লীলা প্রকটনের পারম্পর্য্য রক্ষা পাচ্ছে। তাই ইউরোপের প্রচণ্ড ধ্বংস লীলার পরে নতুন সৃষ্টির জন্য একটা উদ্দাম চপলতা জেগে উঠেছে। সেখানে সব সংস্কার সব বাঁধন সব পদ্ধতি ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সে ভাঙ্গনের পশ্চাতে মানুষ সবদিক দিয়ে মুক্ত বাঁধনহারা হবার চেষ্টা পাচ্ছে, কারণ তারা চাইছে নতুন সৃষ্টি নতুন গাঁথনীতে গড়ে তুলতে! বাঁধা সংস্কারে পুরাণো ভাবমোহে অন্ধ মন নতুন পথে এগোতে চাইলেও যে এগুতে পারে না, এটা খুব খাঁটি সত্যি কথা। স্বীকার করি পুরাণোর একটা প্রাণভোলান প্রচণ্ড মায়া আছে; যার জাল ছিঁড়ে নতুনের পথে এগোনো শুধু কঠিন নয় অনেক সময়ে অসাধ্য ও বটে, পুরাণোর ভয়ে পিছু টানে মানুষ কেবল যাই যাই করে আর চমকি চমকি পিছনে চায়। তাই সৃষ্টির চেয়ে ভাঙ্গন বড় কঠিন, কারণ ভাঙ্গন সুন্দর

হলে গড়ন ও সুন্দর হবে। এটা এখন সকলেরই মনে খুব দৃঢ় রকমেই ভিৎগেঁথে বসেছে যে নতুনের সৃষ্টির সময় এসেছে। এখন সকলেই নিশ্চয় বুঝছেন—

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশ খানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে,
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতার আহ্বানে সকল দেশেই শিকল দেবীর পূজাবেদী ভাঙ্গবার জন্য ঝড়ের মাতন আসেই। তখনই দেখা যায় অট্টহাস্যে দেশের আকাশখানা প্রতিধ্বনিত করে ভোলানাথের পার্শ্বচরেরা বিজয় কেতন নিয়ে ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। তাতেই সমাজ ভাঙ্গে, সঙ্ঘ ভাঙ্গে, বাঁধা-ধরা একটানা ভাবধারা কোথায় লোপ পায় কে জানে, তখন আসে এক ভৈরব হুঙ্কারে প্রমত্ত নর্ত্তনে দেশের তরুণ কাঁচার দল। সব দেশেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ হয়ে গেছে, সব সমাজেই ভাঙ্গার শক্তির পরীক্ষা হচ্ছে ও হবে, সকল সঙ্ঘেই পাগলামি এমনি করে বাঁধনের দুয়ার ভেঙ্গে ছুটে বেরোচ্ছে। কারণ মানুষ জানে সেই পথেই মানুষের শক্তির অখণ্ড ঘর।

যে বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, যে জীর্ণ আবেষ্টনী টেনে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তার জন্য সময়ের অপেক্ষা করে পাঁজি পুঁথি হাতে নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। সেখানে অনেক মায়া কাটাতে হবে, অনেক লোভ দমন করতে হবে, সেখানে প্রাণ খুলে বলতে হবে—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।"

উদ্দাম বাসনাই সেখানে পথ প্রদর্শক। হয়ত অনেক সময়ে কত দিনের স্নেহবন্ধন ছিড়ে ফেলে চলে যেতে হবে, কত লোকগঞ্জনার ভিতর সরল মনকে আঘাত পেতে হবে; কিন্তু যখন সমাজের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণের মাঝে ভগবৎ প্রেরণা আসে, তখন সে

বিবেকের আহ্বানে কর্ত্তব্যের ডাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়, অনেক বিরহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তপঃশুদ্ধ হতে হয়, অনেক প্রীতির বন্ধন যা জীবনের বিমল রসে সিক্ত হয়ে প্রাণের মাঝে দৃঢ় হয়ে ভিৎ গেঁথেছে, সে সবগুলিও সমূলে টেনে ফেলতে হয়। ব্যাথা লাগে সত্যি কথা, কিন্তু যখন বুঝতে পারা যায় অন্তরের অন্তর থেকে কে আমায় কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়বার জন্য আকুলকণ্ঠে ডাকছে, যখন বুঝতে পারা যায় যে 'মহাকাশ হতে ঐ বারে বার আমারে ডাকিছে সবে," তখন অনেক ব্যথা সহ্য করেও ছুটে আসাই পুরুষকার। তখন সে স্নেহপ্রেম ভালবাসার কাছে বিদায় নিয়ে বলতেই হবে—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আঁখি
অমিয় রচন সোহাগ বচন অনেক রয়েছে বাকী।"

কিন্তু উপায় নেই—

"আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্ম্মম আমি আজি
আর নাই দেরী ভৈরব-ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।"

এখানেই সাধারণ মানুষ আর অতি প্রাকৃত লোকের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পায়। সাধারণ মানুষ চায় নিজের পরিবারের মধ্যে আত্মস্থ থেকে শান্তির কোলে বসবাস করতে, সেই তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তার পরিবারের বাহিরে দেশের বা দেশের কি অবস্থা হলো, তাদের উন্নতি করবার তার যদি শক্তি থাকে, সে শক্তি সে ব্যয় করবে কি না সে কথা সে ভাবে না কিংবা ভাববার চেষ্টাও করে না। কারণ জাতির বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের দিকে ত তার লক্ষ্য নেই, তার লক্ষ্য আছে আত্মপরিবারকে কেন্দ্র করে যে ছোট একটি জগৎ সে গড়ে তুলেছে সেই স্বার্থের সীমার দ্বারা নিবদ্ধ একটা ছোট স্বার্থপর জগতের পানে। এমনি করে একটানা জীবন প্রবাহের সঙ্গে চলেই ত সাধারণ লোকে জন্মগ্রহণ করে, আহার নিদ্রা বিলাস নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারপর একদিন অন্তিম নিশ্বাস ফেলে অনন্ত জীবসাগরের মধ্যে জলবুদ্বুদের মত কোথায় বিলীন হয়ে যায় কে জানে! কিন্তু অতি প্রাকৃত লোকদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা নিজেদের পরিবার নিয়ে ক্ষুদ্রগণ্ডী বেঁধে সুখশান্তিতে থাকতে চান না, তাঁরা চান বিরাট দেশের সুখশান্তি নিয়ে গড়ে উঠতে। হয়ত তাতে তাঁদের নিজেদের পরিবারে মর্ম্মান্তিক বেদনা পান, হয়ত সে বেদনার আঘাতে তাঁদেরও জীবনবীণার দু একটি তার বেসুরা হয়ে যায় এমন কি ছিঁড়ে পর্য্যন্ত যায়; কিন্তু তাঁদের লক্ষ্যস্থল অনেকটা বড়

কর্ম্মভূমিকে কেন্দ্র করে, তাঁদের জীবনের বাসনা নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিবারের সুখশান্তি পাওয়ার চেয়ে অনেক মহৎ। সেই জন্যই দেখি শ্রীচৈতন্য যখন মাকে কাঁদিয়ে স্ত্রীকে দুঃখ দিয়ে সব মায়া মোহের বন্ধন ছিঁড়ে এসেছিলেন দেশবাসীকে সুখ শান্তি দেবার জন্য, তখন তাঁর মনে নিশ্চয়ই এই ভাব প্রবল হয়ে ছিল—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে, কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।"

তাই এই মায়ারবন্ধনের ভাঙ্গনের উপর গড়ে উঠেছিল, আচণ্ডালকে কোল দেওয়া একটা অপূর্ব্ব প্রেমের মন্দির। কোনও নতুন জিনিষ গড়তে হলেই আগে ভাঙ্গনের প্রয়োজন।

বিশ্বের যে কোনখানে যা কিছু পবিত্র জিনিষ, কি ধর্ম্ম কি সাধনা, তা সব গড়ে উঠেছে ভাঙ্গনকে ভিত্তি করে। কিন্তু যারা এই ভাঙ্গন দিয়ে গড়নকে বরণ করে আনতে যান তাঁদের সব দেশে সব যুগেই অসহ্য লাঞ্ছনা প্রাণঘাতী গঞ্জনার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়েছে। তাই যিশু খৃষ্ট যখন পুরাণের সংস্কারগুলি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করছিলেন, ঠিক সেই ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছিল এক অতি পবিত্র যুগধর্ম্ম। এ ভারতেও যখন শাক্যসিংহ সকল মায়ার বেষ্টনী ভেঙ্গে আত্মপরিবার সকলকে কাঁদিয়ে বের হয়ে ছিলেন, তখন কি বুঝতে পারেন নি আমার পরিবারের সুখ শান্তি যে এতে একেবারে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাগলের মত বুকফাটা ক্রন্দন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কেন? কারণ এই ভাঙ্গার দ্বারা একটা মহত্তর কিছু গড়ে তুলতে। তাঁকে যে উদ্দাম ভাবে পাগল করে ঘর ছাড়া করে নিয়ে এসেছিল, তা তাঁকে ভাবিয়ে দিয়েছিল—

"কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে"।

তাই অসহ্য নির্য্যাতনের পরে অসংখ্য ভাঙ্গনের মাঝে গড়ে উঠেছিল এক প্রশান্ত বিশ্বধর্ম্ম, যার প্রচ্ছায় শীতল আশ্রয়ে এখনও পৃথিবীর কত লোক সুখ-শান্তি উপভোগ করছে। সবটাতেই দেখা যায় নতুন কিছু মহত্তর গড়তে হলে ভাঙ্গনের প্রয়োজন সবার পূর্ব্বে। তখন দ্বিধা-সঙ্কোচ লাজ ভয় সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রীতি ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কেবল ভাঙ্গনের মুখে ছুটে

যাওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ ; তারপর দেখতে দেখতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শিল্পকলা ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান প্রজ্ঞান যা কিছু তর্ তর্ করে অনন্তর প্রয়াসে গড়ে ওঠে। সত্যি এই হচ্চে বিশ্বের ইতিহাসের ধারা।

তাই এ ভারতের যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে তোলবার মূলে রয়েছে প্রকাণ্ড এক ভাঙ্গনের খেলা। কারণ যে বন্ধনটা বড় আঁকড়ে আছে, তাকে ছিন্ন করতেই হবে, যে শিকলটা গলায় বড় বাজছে তাকে ভাঙ্গতেই হবে। তারপর সেই মুক্তশক্তির উপর ভর দিয়ে সাধীনতার লীলা ভবন গড়ে উঠ্‌বে। আমাদের জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে বাইরের দিক থেকে সর্ব্বপ্রথম বাধা হচ্ছে সমাজের অটুট বন্ধনগুলি। আমাদের এই সমাজবন্ধনের মত এমন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার আর কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা সন্দেহ। এ শাস্ত্রের বিচার মানে না, গুণের আদর জানে না, একটা প্রবল ঝঞ্ঝার মত এসে দুমড়ে দিয়ে পিষে ফেলে একটা নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেয় কারণ এ অন্তরে বাহিরে পরাধীনতার দেশে শাস্ত্র টাস্ত্র বড় কিছু নয় আচারই নাকি আসল ধর্ম্ম ; আচার বন্ধনই আষ্টে পৃষ্টে মানুষকে বেঁধে রেখেছে। কপটতা ও সঙ্কীর্ণতায় সমাজ যে একেবারে অন্তর সার শূন্য হয়ে কেবলি ফেঁপে উঠেছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে জড়দেহ বেশীক্ষণ আপনাকে খাড়া রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই। অথচ এই হিন্দুসমাজই একদিন ক্ষত্রিয়-বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়েছিল, ধীবর দৌহিত্র দ্বৈপায়নকে বেদবিভাগের অধিকার দিয়েছিল এবং তারই ফলে কত পুরাণ কত সংহিতা হিন্দুশাস্ত্রকে জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত করে দিয়েছে। আর এখনকার হিন্দুসমাজ শুধু ত্যাগনীতি অবলম্বন করে গ্রহণের সামর্থ্যকেই একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রথমেই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হলে এ সব সমাজ বন্ধনকে আগে ভাঙ্গবার প্রয়োজন হবে। এ সব বেষ্টনী ভেঙ্গে গেলেই সকলে এক অখণ্ড ধর্ম্মকে গড়ে তোলবার শক্তি পাবে। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, আচার কেবল বাহিরের ঠিকাদারি প্রহরীমাত্র। ভাঙ্গনের যে প্রয়োজন এসেছে, সে কথা না বুঝলে আর চলে না।

তাই দেশ এখন এসে পৌচেছে এমন অবস্থায় যেখানে—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্র বেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতি প্রেম নাম ধরি ; প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মের ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে সমাজের বন্ধন যেমন বাহিরের প্রচণ্ড বাধা, তেমনি কুশিক্ষার বন্ধন তার অন্তরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কারণ বর্ত্তমান যে শিক্ষা আমাদের দেশে খাড়া করা হয়েছে, তা পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে প্রাণের অভাব বড় বেশী করেই অনুভব করা যাচ্ছে। এই শিক্ষা দীক্ষার ফলে আমরা আহারে ব্যবহারে আঁচারে বিচারে ভাষায় ভাবে ধর্ম্মে কর্ম্মে সমস্ত জীবন ক্ষেত্রে প্রতিপদে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আসছি। মন্দিরের বদলে সভা করেছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল খুলেছি, থিয়েটার করে আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করে অনাথ আশ্রমের চাদা তুলি ; দেশে যত রকমের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার সহজ উপায় ছিল, তার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করেছি, অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবন যাপনের উপায় মাত্র তা ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের নকলে অর্থোপার্জ্জনের জন্যই জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছি। এমনি করে আমরা দেশের সাথে প্রাণের যোগ হারিয়ে ফেলেছি। আসল কথা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষার আদর্শও আগা গোড়া না ভাঙ্গলে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠ্‌বে কি করে। ইহাকে আমাদের দেশের স্বভাব ধর্ম্ম সভ্যতা ও সাধনার সাথে যোগ করে দিতে না পারলে এবং এই শিক্ষা সাধারণের সহজ প্রাপ্য করে তুলতে না পারলে আমাদের ঘোর বিপদের কথা। আমাদের হাব-ভাব আচার ব্যবহার সবই এত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কোনও যোগই বুঝি নেই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করে তার প্রাণের কাছে গিয়ে তাকে ছুঁতে পারিনি। আমরা মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি একটু চালাক হয়েছি মাত্র। তাই আজ তথাকথিত শিক্ষিতের দল যারা "নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক জনমের গ্লানি", তাদের অবস্থা দেখে বড় দুঃখে বলতে হয়—

"সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

* * * * *

আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন

তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।"

আর দেশের যারা সত্যি প্রাণ, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায়নি বলে আমাদের কাছে অবজ্ঞা পেয়ে আসছে, তাদের দয়ামায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথি সেবা করে দেবতাকে ভক্তি করে। তারা ঘোর দারিদ্র্যের মাঝে মরতে মরতেও বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রেখেছে, যারা সব রকম সেবায় নিরত থেকে আজও বাঙ্গলার ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যারা আজও শুদ্ধচিত্তে সরলপ্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়; মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে, যাদের জন্য বাঙ্গালী আজও বাঙ্গালী, যারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হয়ে বাঙ্গালীজাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালিয়ে জাগিয়ে রেখেছে, তাদের ভিতর দিয়েই বাঙ্গলার সনাতন শিক্ষার ধারা বয়ে আসছে। তারা সবল স্বাধীন সরলপ্রাণ, কোনওখানে আত্মার নিষেধ না মেনে এক মহান বিপুল সত্যপথে চলেছে, তাদের আদর্শ ই যে বাঙ্গলার আদর্শ। বর্ত্তমান শিক্ষাকে আমূল না ভাঙ্গলে জাতীয় শিক্ষার মন্দির গড়ে উঠবে না। এখন এমন শিক্ষা চাই যাতে দেশের আপামর দুনিয়ার জীবনযুদ্ধে যোগ দিতে পারবে, সকল জাতির সঙ্গে সমক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারবে। কারণ শিক্ষার মূলের কথাই হচ্ছে জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল দিক দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গড়ে তোলা। এ শিক্ষার কণামাত্রও দেশবাসী এখনও পায়নি, তাই দেশে আজ মানুষের এত অভাব। সেই জন্যই দুঃখ করে আমাদের বলতে হয়—

"আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধির পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর-ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরমস্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ ?

কে রাখিবে ভরি নিজ অনন্ত আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার ?

আজ তাই কেবল ভাঙ্গনের পালা এসেছে, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেশ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। তারপর সেই শ্মশানে শক্তির সাধনা চলবে এবং বোধ হয় তখনি সেই ভাঙ্গনের শ্মশানের উপর গড়ে উঠবে নতুন মনুষ্যত্বের নতুন সাধনার দেবমন্দির। এ ভাঙ্গনের মাঝে প্রবল হৃদয় শক্তির প্রয়োজন হবে, ভগবানের কাছে ব্যাকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করতে হবে—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য জ্বলে উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে ; যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।"

তারপর জগতের সব চেয়ে বড় সমস্যা জীবন সমস্যা। ধর্ম্মের পথে থেকে বিবেকের বাণী অনুসরণ করে জীবিকা অর্জ্জন করা এখন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপার্জ্জনের পথ এত সঙ্কীর্ণ যে মিথ্যার আশ্রয় না নিলে সেখানে প্রবেশ করা কঠিন্। এই জন্য জাতীয় আদর্শ হারা হয়ে উঠছি, অন্তরের কোমলতা হারিয়ে ফেলছি। এখানেও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। তাই এ সব উপার্জ্জনের পথ ছেড়ে দিয়ে ভারতের যে আদর্শ সেই পবিত্র সরল জীবন তারই পথ ধরবার চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্যই দৈনিক আহার বস্ত্র সংগ্রহ করবার পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের মোহনায় মিল ফ্যাক্টরী ছেড়ে দিয়ে চরকা তাঁত প্রভৃতি সহজে জীবিকা লাভের ব্যবসায় গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। শুদ্ধচিত্তে পুণ্যমনে সংযম ত্যাগ ও বিলাসবিহীনতার পথ ধরে লুপ্ত মনুষ্যত্ব অনুসন্ধান করে আনতে হবে। তাই এ ভাঙ্গনের পথ এখন সব চেয়ে বড় পথ, কারণ বর্ত্তমান যুগপ্রেরণাও ঐদিকেই ইঙ্গিত করছে। ভেবে ভেবে পথ চেয়ে বসে থাকলে আর চলবে না, কারণ ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়নের পত্তন হতে থাকবে। শুধু সমাহিতমনে তপঃশুদ্ধপ্রাণে সেই ভাঙ্গন-গড়নের একমাত্র নিয়ন্তার কাছে নত হয়ে নিবেদন করতে হবে—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,

এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধুলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিয়ে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব্ব চির পরিহার।
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকমাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।"

কোকিল ছানা

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

সত্যঘটনা

নিরাশ্রয়া অন্ধ দুঃখিনী কুলীরমণী সে। আড়কাঠির প্রলোভনে পড়িয়া আসামের চা বাগানে গিয়াছিল।

আজকালকার দুর্দ্দিনে, ও দৈন্যও অভাবের নিদারুণ নিস্পেষণে যখন তাহারা মরিয়া হইল, তখন একদিন দলে দলে আসাম কুলীরা "মহাত্মা গান্ধী জী কি জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোনো প্ররোচনা, কোনো ভয়-দেখানোর পরোয়া আর তাঁহারা রাখিল না,—প্রতিজ্ঞা এবার দেশে ফিরিবেই। এ মাত্র সেদিনের কথা,—সবে দীনহীনের আত্মশক্তির উদ্বোধন হইতে সুরু হইয়াছে।

আসাম হইতে দলে দলে কুলীরা আসিয়া চাঁদপুর জুটিল। সরু সরু হাত পা, পাঁজরের হাড়গুলি গোণা যায়, সারা দেহের গাঁটগুলি অস্বাভাবিক রকম স্ফীত, টোলপরা গালের উপরে চোয়ালের হাড় পাহাড়ের শৃঙ্গের মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—সারা গায়ের মধ্যে হাড়ের ফ্রেমে আঁটা পাম্পকরা ফুটবলের

মতো পেটটাই দর্শন যোগ্য হইয়া বাড়িয়াছে। তাহাতে নীল নীল শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সেগুলি দূরবীনে-দেখা মঙ্গলগ্রহের খাল!

'পরিধানে চীরবাস'—অত্যন্ত ময়লা, যেন কাদা জলে ডুবাইয়া রৌদ্রে শুকান হইয়াছে। তা'ও পুরুষদের কৌপীনের মতো পরা মেয়েদের বক্ষ হইতে আজানু কোন প্রকারে ঢাকা। মাথার চুল স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই অতি অল্প, তৈলাভাবে রুক্ষ ও জটিল। সকলের সঙ্গেই এক একটী পুঁটুলী আছে, তাতে সম্বল—একটা ঘটি, খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়া, চার ছ' আনার পয়সা—আর একটী করিয়া তামার চাকৃতি। ঐ তামার চাকৃতিই নাকি তাদের বাগানে অমূল্য সম্পদ, উহা চা-কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত-করা দোকানে দেখাইলে তিনটী আনা মুল্যের খাদ্যসামগ্রী তাহাদের দেওয়ার কথা। ইহার উপর দোকানদারের "ফাউ" লাভ ত আছেই। বেচারা পাইতে পাইতে পায় গিয়া হয় তো আট পয়সার জিনিষ। মাইনা বাবদ নগদ পয়সা কুলিদের হাতে দেওয়া হয় না, পাছে পয়সা জমাইয়া তাহাদের খর্পর হইতে উহারা পালায়। প্রায়েরই উপর মা ষষ্ঠির যথেষ্ট কৃপা আছে বলিয়া বোধ হইল—প্রত্যেকের সঙ্গেই দুইটী তিনটী করিয়া অপগণ্ড আছে,—প্রায়ই উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ। সবারই চেহারা এক রকম,—হাড়ের কাঠামের উপর যেন আঠা দিয়া চামড়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এরা সব যেন মূর্ত্ত নিঃস্বতা!

হ্যাঁ সেই কুলিরমণীর কথা বলছিলাম। যখন দলে দলে কুলী আসিয়া চাঁদপুরে জড় হইল, তখন সেও আসিয়াছিল। নদীর পাড়ে মারক্যান্‌টাইল ব্যাঙ্ক এর পাট গুদামে হইয়াছিল তাহাদের আস্তানা। এক একটা গুদামে থাকিত সত্তর, আশী নব্বই জন করিয়া! বিসূচিকা দেখিল বড় সুযোগ যায়,—সে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিল না। যাঁহারা কাগজ পত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন কিভাবে তখন কুলীর দল নিঃশেষিত হইতেছিল। রোজ পনর,—বিশ—পঁচিশটা করিয়া লোক মারা যাইত। ব্যামোটা হইত ভারি অদ্ভুত রকমের—আগে ধরিত পেটের অসুক বা' আমাশায় রোগে। দুই একদিন পরে বিসূচিকা লক্ষণ দেখা দিত।

সে দিন আস্তানায় তদন্ত করিতে গিয়া আমি অন্ধ রমণীটীকে কুড়াইয়া আনি। রোগের আক্রমনে শিথিল হস্তে সে তখন তাহার শিশুটীকে আঁকড়াইয়া ছিল। শিশুটী একটু অস্বাভাবিক, সাধারণ কুলী বালকদিগের মতন অত কালো নয়,—কালো নয় কেন বেশ ফর্সাই। হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও

গাল দুটী নিটোল। পেটটা অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও প্লীহা এখনও খুব বেশী বাড়ে নাই। লম্বা লম্বা চুলগুলি ঈষৎ পীতাভ চোখ দুটীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে বালিকা টুলটুল করিয়া তাকাইতেছিল। দেহের উপর দিয়া তাহার বোধ হয় বার দুই বসন্তের হাওয়া বইয়া গিয়াছে।

ষ্ট্রেচার"—এ মা-মেয়েকে লইয়া অসিয়া যখন রুগ্নাকে বিছানায় শোয়াইবার জন্য বালিকাকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইলাম, তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন মেয়েটীর দুর্ব্বল হস্তের বাঁধুনি খুলিয়া আসিতেই আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বলিয়া উঠিল" মেরী—মেরী লড়্কী মেরী লড়কীকো কাঁহা লেতেহো বাবুজী" ?

আমি শিশুকে বাঁহাতে বুকে তুলিয়া লইতে লইতে তাহার উদ্যত হাতদুখানি আস্তে আস্তে বুকের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম "কুছ ডর নেহি মাই, হামরা পাস তেরী লড়কী বহুত আচ্ছা হালমে রহেগী,—বুখার মে তুম্ কেইসে আপনী লড়কীকে তদ্‌বির করোগি।"

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটী বলিল "নেহি নেহি বাবুজী, লড়কীকো দেও—মেরী লড়কী" আমার সঙ্গী কালিকেশববাবু রোগিণীকে ষ্ট্রেচার হইতে শয্যায় তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন,—তিনি বলিলেন "মাই—কোন চিন্তা নেই তোমার। তোমার মেয়ে ভালোই থাকবে। রোজ দেখো—তোমায় দেখিয়ে নে যাবো,—তুমি শীগগির ভালো হয়ে ওঠো—"

"—নেহি—নেহি"—বলিতে বলিতে মেয়েটী অত্যন্ত অস্থিরভাবে একহাত আমার ক্রোড়স্থ শিশুর পানে বিস্তৃত করিয়া দিয়া অন্যহাতে মাটী ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ দুই তিন সেকেণ্ড পরে তাহার মাথাটা টুপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কালীবাবু নীচু হইয়া রোগিণীর মাথা বামহস্তের উপর তুলিয়া ধরিলেন বটে, কিন্তু সে এই উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কালীবাবুর হাতের উপর তাহার মাথাটা গড়াইতে লাগিল,—সে বলিতেছিল "নেহি বাবুজী, মেরী লেড়কী, মেরী—মেরী দুলারী,—মেরী লেড়কী"—কালীবাবু তখন সন্তর্পণে রোগিণীকে বিছানায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন। আমি আর কোনো কথা না বলিয়া মেয়েটীকে বুকে লইয়া বাহির হইয়া গেলাম রেজিষ্ট্রী অফিসে,—রোগিণীর নাম ভর্ত্তি করিবার জন্য। রাস্তায় আশুবাবু, বিনয় ও রামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসী স্বামী ভূমানন্দের সহিত দেখা হইল। তিন জনেই বলিলেন "বাঃ দিব্য—

ছেলেটীতো দেখছি,—কোথায় পেলে ?" আমি শুধু জবাবে "না মেয়ে"—বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলাম।

শেষ রাতের দিকটায় আবার আমার ডিউটী ছিল। ডিসেণ্টী ওয়ার্ড এ ডিউটী করা এক ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগীদের বিছানা বদলাইতে হয়,—একটুও পা জিরাইবার জো নাই। একদফা সবগুলি বিছানা পরিষ্কৃত করিয়া একটা টুল টানিয়া একটু বসিয়াছি, চোখ দুইটা যেন আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিতেছিল ;—এমন সময় সেই অন্ধ রমণীর পাশের রোগীটা ডাকিয়া উঠিল "বাবুজী—পানি"। আমি তড়বড় করিয়া বলিয়া উঠিলাম "লাতা হুঁ",—মনে হইতেছিল দুই তিন বার ডাকিয়া হয়তো বা রোগীটা সাড়া পায় নাই। মেজার গ্লাসে করিয়া তাহার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলাম ;—দিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় সেই অন্ধ মেয়েটী বলিল "বাবুসাব মেরী লড়কীকো কাহা ভেজা" ? আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম, সেই সকালবেলা গোটা দুই কথা মাত্র ইহার সঙ্গে কহিয়াছি, ইহার ভিতর সে আমার গলার আওয়াজ চিনিয়া ফেলিয়াছে।

গলার স্বর তাহার উদ্বেগ কম্পিত।

রোজ রোজ পোনের বিশটা করিয়া লোক মরিতে দেখিয়া উহাদের একটা আতঙ্ক হইয়া গিয়াছিল যে হাসপাতালে আসিলেই রোগী বুঝি আর বাচেনা। এই ভয়ে অনেকে রোগ গোপন করিয়া থাকিত। ব্যারাকের পরিদর্শক ডাক্তারকে কোন কথা বলিত না—ও ইহার ফলে প্রায়ই সকালবেলা ব্যারাক পরীক্ষা করিলে দুই তিনটা মৃতদেহ পাওয়া যাইত। মেয়েটীর হয়তো মনে হইতেছিল তাহাকে যখন হাসপাতালে আনা হইয়াছে,—তখন সে তো বাচিবেই না,—মরিবার আগে বুঝি সে তাহার নয়নমণি কন্যাটীকেও দেখিতে পায়না ! আমি কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতে-ছিলাম,—পায়ের শব্দ অনুসরণ করিয়া সে এবার জোরে ডাকিল 'বাবুজী—"

এবার আর জবাব না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম "কেও মাই, তুমারী ছোকরী তো আবহি নিন্দ মে হ্যায়। ফজির হোনে দেও তব উসীকে তুঝে দেখলাউঙ্গা"।

ব্যগ্রকণ্ঠে রমণী বলিল "ফজির তো হো গিয়া বাবুজী—" আমি একটু বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম "নেহি নেহি ফজির নেহি হুয়া নিন্দ যাও আভি"—স্বরে বিরক্তির রেশটা বোধ হয় সে ধরিতে পারিয়াছিল, গলা নামাইয়া ভীত ধীর

কণ্ঠে সে বিড় বিড় করিয়া বলিল "নিন্দ বাবুজী,—মেরী দুলারী—ইয়ে দো বরষ, মেরী দুলারী—কলিজা মেরী কলিজা"—লণ্ঠনের মিটমিটে আলো তাহার গালের একপাশে পড়িয়াছিল, দেখিলাম সূক্ষ্ম একটী অশ্রুরেখা তাহার উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। একটু কষ্ট হইল। একবার ভাবিলাম দুইটা মিষ্ট কথার সান্ত্বনা দি। কিন্তু এত রাত্রে কিছু বলিলাম না। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও সমস্ত ব্যথা ছাপাইয়া কোন্ শক্তির বলে যে তাহার মেয়ের ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত আমার ভাবিবার অবসর ছিল না। তাহার পরে একদিন সে আমাকে বলিয়াছিল, যে দুলারী তাহার কী,—সে যে তাহার কলিজার কলিজা। বর্ষ দুইটী বক্ষোনীড়ে জড়াইয়া ধরিয়া সে তাহার দুলারীর মাথাটী বুকের মাঝে খুঁসিয়া রাখিয়াছে,—রো-জ রাতে। একান্ত নির্ভরতায় লতাইয়া পড়া দেহখানি,—সে ঘুমের ভাঙ্গনের মধ্যে মধ্যে কতবার চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছে। চুম্বনের দৌরাত্ম্যে আধঘুমভাঙ্গা শিশু কী রকম ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলগুলি দিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্যুত মাতৃস্তন্যটীকে মুখে পুরিয়া আবার চুকচুক্ সুরু করিয়া দিত! তার এক সাজি কুন্দফুলের মতো দেহখানি নড়িয়া চড়িয়া উঠিলে কি তাহার কোমলস্পর্শ,—অন্যে তাহা কি বুঝিবে? তাহার মাথার ঘ্রাণ মায়ের মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়া কি রকম জানি মোহতন্দ্রার সৃষ্টি করিত,—মা আবার ঘুমাইয়া পড়িত। আজ চব্বিশ মাস এমনি গিয়াছে। সে বুক তাহার খালি! তার ছোঁয়ার অনুভূতিটুকু নাই, মৃদু নিশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায় না, মাথার ঘুম-পাড়ানি ঘ্রাণটুকু হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে না, তাহার ক্ষুধিত বাহুর আলিঙ্গনে কুন্দকুসুমের ডালি তুক্ তুকে নরম দেহখানি সে আজ হাতড়াইয়া মরিতেছে, সে ঘুমায় কি করিয়া,—আর বাবুজী তাহাকে বলিয়াছেন নিন্দ্ যাইতে!

ঘণ্টা খানেক পরে মেয়েটী ভীত কুণ্ঠিত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল "বাবুজী —ফজির—" কি করুণ তাহার স্বর! বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, রাতের আঁধার আর প্রভাতের আলোতে স্বাগত সম্ভাষণের কোলাকুলি সুরু হইয়াছে। আকাশে দু' একটা তারা তখনও উঁকিঝুকি মারিতেছিল। আমি এবার একটু কোমল কণ্ঠেই বলিলাম "হাঁ মাই আব্ হি উসীকো লাউঙ্গা,—এক ঘণ্টা ঔর সবুর করনা।"

"ঔ—র এক ঘণ্টা" টানিয়া টানিয়া এইটুকু বলিয়া সে তখনকার মত চুপ করিল।

(২)

সে-দিন মিসেস্ স্মিথ্ রোগিদের দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। মিসেস্ স্মিথ্ ওখানকার পাদ্রী-সাহেবের পত্নী। তাঁহার কাছে কয়েকটী পিতৃমাতৃহীন কুলী বালকবালিকা রাখা হইয়াছিল। আমরা ঠিক করিলাম এই অন্ধরমণীর বালিকাকেও তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিব। তিনি সানন্দে রাজী হইলেন। পাদ্রীসাহেবের মতলব ছিল উহাদিগকে সব খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। কিন্তু তাহা আমরা দেই নাই। পাদ্রীসাহেব উহাদের অবশেষে ছাড়িয়া দিতে একটু গররাজী ভাব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ডাক্তার বাবু ভারী স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তিনি পাদ্রী সাহেবকে বলিয়াছিলেন "যদি তোমরা এদের একটাকেও খৃষ্টান কর, we shall make christianity inpossible in India" ক্ষুণ্ণ হইয়া ইহার উত্তরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কেন ডাক্তার বাবু খৃষ্ট ধর্ম্মটা কি খারাপ মনে করেন আপনি" ডাক্তার বাবু জবাব দিয়াছিলেন "ধর্ম্ম কোনোটাই খারাপ নয়। কিন্তু খৃষ্টান করে তোমরা মানুষ তৈরী কর না কতগুলি দাস তৈরী কর। যে ধর্ম্মে জাতীয়তা বোধ ভুলিয়ে দেয় তা' অবার ধর্ম্ম? খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে তোমরা প্রভু যিশুখৃষ্টের সেবক তৈরী কর না ইংরেজ বানিয়ে তোলো। তারা কেন যেন আর ভারতবাসী থাকে না,—হাজারে হাজারে এ প্রমাণ তোমায় আমি দিতে পারি"

এ অপ্রিয় সত্যের জবাব কিছু ছিল না কাজেই পাদ্রী সাহেবও দেন নাই, শুধু "হ্যাঁ হ্যাঁ তা কি—সেটা কি—" ইত্যাদি বলিয়াই ক্ষান্ত পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইংরেজ মিশনারীরা রাজনৈতিক কার্য্যের পরোক্ষভাবে যে কত সাহায্য করিতেছে বলা যায় না।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। মেয়েটীকে কোলে করিয়া আমি গিয়া রোগিণীর শয্যার পাশে দাঁড়াইলাম; ইচ্ছা ছিল মাকে একবার বলিয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিব। ডাকিলাম "ধনরাজিয়া—"

অন্ধ রমণীর নাম ধনরাজিয়া।

"—বাবুজী"

"তোমার লড়কীকে তো মেম সাহেব নিয়ে যাচ্ছে, তুমি ভালো হলে আবার নিয়ে আস্‌বেন।"

"মেম সাব,—নেহি বাবু মেরী লড়কীকো মেরী পাস্ রহনে দিজিয়ে।"

"তোমার অসুখ যে,—ব্যামোর কাছে থাকলে এরও ব্যামো হবে যে।"

সে দিনই সকালে তার কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

আতঙ্কের স্বরে ধনরাজিয়া কহিল" উসী কো ভি বুখার হোগা—উসী কো—"

"হাঁ মাই উসীকো ভি বুখার হোগা," তার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

আশু দাদা মিষ্টি স্বরে কহিলেন, "রোতী হো কেঁও মাই ?—লড়কীকা ভালা করনেকে লিয়ে তো এইসা কাম করতে হেঁ,"—আশু দাদা সাধু পুরুষ। এমন অদ্ভুত লোক আর দেখি নাই। মলমূত্র তিনি চন্দন জ্ঞানে দুইহাতে ঠেলিতেন। তাঁহাকে কুলীরা সবাই 'বাবা' বলিয়া ডাকিত।

অন্ধ রমনী আশু দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল "তুম্ ভি কহতে হো বাবা—আচ্ছা তব যানে দেও—লেকিন মেরী পাস্ এক দফে উসীকো লাও বাবুজী।" ডাক্তার বাবু চোখ ঠারিয়া ঈষারায় রোগীর কাছে শিশুকে লইতে: মানা করিলেন। পরে কহিলেন "মাই বুখার ওয়ালী জনানা কা পাস্ লড়কীকো নেই লেনা চাহিয়ে।"

আমি রোগিণীর বিছানার পাশ কাটাইয়া মেম সাহেবের কোলে শিশুকে দিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ ধনরাজিয়া কাৎ হইয়া খপ করিয়া আমার পাঞ্জাবীর নীচের পকেটটা ধরিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঠিক মত বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে রমণী একবার চেঁচাইয়া উঠিল "দুলারী ও—বা—বু—জী—" তারপর আপাদ মস্তক কম্বলটা টানিয়া দিল। মেমসাহেবের কোঁলে যাইতেই শিশু হাত পা ছুড়িয়া বিষম কান্না জুড়িয়া দিল। মেমসাহেব রোরুদ্যমান শিশুকে সাম্‌লাইতে সামলাইতে প্রস্থান করিলেন। কাপড় ঢাকা মেয়েটীর পানে চাহিয়া দেখিলাম। ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার সে কি কান্না!

* * * * * *

পরে একদিন কন্‌ভেণ্ট-এ গিয়াছিলাম। শুনিলাম দিন পোনেরো ষোলো দুলারী নাকি মার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিয়া ছিল। তারপর সেখানকার লোকদের, বিশেষতঃ মিসেস্ স্মিথ্ এর চেষ্টায় বনের পাখী বেশ পোষ মানিয়াছে, দিব্য এখন সে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া বেড়ায়। এখন কান্নাকাটি গিয়াছে। সে হাসেও খেলেও,—তার দুষ্টমীতে সবাই অস্থির। তার নতুন নাম হইয়াছে 'লিলি'।

* * * *

পাঁচ সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। রমণী প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের উপরে রোগ জনিত পাণ্ডুর আভা এখনও মিলায় নাই। তথাপি দ্বাবিংশ বৎসরের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী তাহার দেহখানির উপরে যে সহজ লাবণ্যের ছোপটুকু ধরাইয়া দিয়াছে তাহা এত অত্যাচারেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই।

আজ খুকীকে লইয়া আসিবার দিন। আমি দাওয়ার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রোগীদের জন্য মল্টেড মিল্ক তৈরী করিতেছিলাম। এই মাত্র সে আমার কাছে বসিয়া তাহার প্রিয়তমা লড়্কীর ইতিহাস শেষ করিয়াছিল। বাগানের মেয়েদের মধ্যে সেই নাকি খুবসুরৎ ছিল,—তাইতে সে ছোট সাহেবের নেকনজরে পড়ে। সাহেব তাহার চোখদুটীর নাকি খুব তারিফ করিতেন। সেই চোখ দুটীই যখন তাহার টাইফয়েড জ্বরে সে জন্মের মত হারাইল, তখন সাহেব ছিন্ন মালার মতো তাহাকে পথের পার্শ্বে ছুড়িয়া ফেলেন। তখন দুলারী পেটে। ফের সে চায়ের পাতা তুলিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু তাহার বরাদ্দ হইল দৈনিক তিন আনার জায়গায় ছয় আনা। কিন্তু সেটা ছোট সাহেবের অন্ধ রমণীর প্রতি করুণার পরিচয় কিম্বা প্রণয়ের প্রতিদান তাহা ঠিক বলা যায় না। তারপর দুলারী হইল। সেই একমাত্র তাহার খালি বুকটাকে ভরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার নাম সে সাধ করিয়া রাখিয়াছিল দুলারী। কি করিয়া সে যে তাহাকে মানুষ করিয়াছে! রোজ ছ' আনা সংগ্রহের মধ্যে দুলারীকে খাওয়াইয়াছে তিন আনা, তার বিবাহের জন্য জমা করিয়াছে দুই আনা; আর তাহার নিজের জন্য ব্যয় হইয়াছে চার পয়সা। এই গেল তাহার দুই বৎসরের ইতিহাস। এই নির্লজ্জ নির্ম্মতার কাহিনী সে বেশ নিঃসংস্কোচে বলিয়া গেল। বোধ হইল—যেন এ অতি সাধারণ কথা, নিত্যকার ব্যাপার। আমি ভাবিতেছিলাম,—কিন্তু সন্তানের জন্য এই যে অগাধ স্নেহ—ইহা এই বন্য অসভ্য স্ত্রীলোকটা কোথায় পাইল?

তখন সূর্য্য ডোবে ডোবে। কাহিনী শেষ করিয়া মিনিট দুই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। অষুধপত্র রাখিবার টেবিলটার হাত চারেক দূরে একটা মাদুরের উপর সে বসিয়াছিল আর গায়ের কম্বল খানার প্রান্তভাগটা মাঝে মাঝে অকারণ নির্দ্দয় ভাবে মোচড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে মাদুরটাকে দুইহাতে ঝাড়িতেছিল,—কখন শুইতেছিল আবার একটু পরেই উঠিয়া বসিতেছিল। তাহার কাহিনী শেষ হইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে

সে আমাকে অন্তত সাত আটবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে মেম সাহেব আসিবে কি না,—কখন আর আসিবে সন্ধ্যা যে হইতে চলিল, তাঁহার অসুখ হইয়াছে নাকি,—দুলারী ভালো আছে তো,—মেম সাহেবের কুঠি খুব দূরে নাকি—আরো সব কত কি ! আমি রোগীদের ফরমায়েস যোগাইতে যোগাইতে দুই একটা হাঁ না বলিয়া তাহার জবাব সারিতেছিলাম। ক্রমে সে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল। মাঝে মাঝে তাহার চোখের কোনে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে ছিল—এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার আশ্বাস পাইয়া নিজের অহেতুকী আশঙ্কাতেই একটু একটু হাসিতেছিল বোধ হয়। আশুদাদা ইতোমধ্যে একবার উহাকে বলিয়া গেলেন ঘরে যাইতে, যে সন্ধ্যা হইয়াছে হিম লাগিবে। নরেনও বার দুই বলিল, কিন্তু কোনো কথাই তাহার কাণে যাইতে ছিল না।

গোটা সাতেকের সময় দুলারী ওরফে লিলিকে কোলে করিয়া মিসেস্ স্মিথ্ দেখা দিলেন। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম ধনরাজিয়া তুহারী লেড়কী আগয়ীরে আমারও ভারী আনন্দ হইতেছিল। আমারি হাতের রোগী এতদিনে সারিয়া উঠিয়া মা মেয়ে আবার দেশে যাইবার স্বপ্ন দেখিতে থাকিবে ! চাহিয়া দেখিলাম, —আমার কথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাহার বুক দ্রুত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন তাহার শ্বাসরোধ হইতে চলিয়াছে। আজ ছত্রিশ দিন সে তাহার খুকীকে বুকে করে নাই ; এতকাল পর মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া সে কি তাহাকে সত্যই পাইবে ?

রুদ্ধকণ্ঠে সে চেঁচাইয়া উঠিল "দুলারী"—কী সে ডাক, যেন মমতার উৎস ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

দুলারী তখনও মেমসাহেবের কোলে। পরণে তার ধবধবে সাদা একটা ফ্রক, পায়ে কাটার বোনা উলের মোজার উপরে বোতাম্ লাগানো ভেলভেটের জুতা, মাথায় লালরংএর একটা টুপী। মেম সাহেব তাহাকে কোল হইতে নামাইতে নামাইতে কহিলেন "যাও লিলি, তুমৃহার মাইকা পাশ যাও"। লিলি তখন মিসেস্ স্মিথ এর বুকে সরু চেইনে ঝুলান সোনার ক্রুশটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

ব্যাগ্র বাহু মেলিয়া ধনরাজিয়া ডাকিল "মেরী মাই,—মেরী দুলারী—"

কিন্তু খুকী তার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া মেমসাহেবকে দুই হাতে জড়াইয়া পরণের মধ্যে মুখ লুকাইল। মুহূর্ত্তেক পরে একবার আড়চোখে মলিনবসনা রমণীর পানে চাহিয়া শিশু নিজের মাকে বলিল "তুম দাই বহ মেরী মাই নেহি।"

উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত

[শ্রীউর্ম্মিলা দেবী]

ভারতের নারীশক্তি একবার ওঠ! জাগ! তোমার আপন আসন একবার গ্রহণ কর! তোমার সহধর্ম্মিনী নাম সার্থক কর। যার আশীর্ব্বাদে জীবন সার্থক করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়। দেশ মাতৃকার আহ্বানে সমস্ত দেশবাসী সাড়া দিয়াছেন, তোমরা কি সাড়া দিবে না? তবে কি করিয়া এই মহাযজ্ঞ সাধিত হইবে? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এই জননীর কি তুমিও সন্তান নও? পুত্রই কি মাতার সন্তান, কন্যা কি সন্তান নয়! একবার ভাবিয়া দেখ এই মা তোমার কত স্নেহশীলা! গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও কত ধৈর্য্যশালিনী! এত অত্যাচার মার উপর করি,—গর্ভধারিণী জননীও এত সহ্য করিতে পারেন না। তিনিও সময় বিশেষে ধৈর্য্যহারা হইয়া সন্তানকে তিরস্কার করেন, প্রহার করেন। কিন্তু দেশমা আমার চির স্নেহশীলা, চির ধৈর্য্যশীলা! সন্তানের সুখের জন্য যে বুক পাতিয়াই দিয়া আছেন!! কত অত্যাচারই না আমরা তাঁর প্রতি করি! তাঁর বক্ষে নিয়ত পদাঘাত করি, তাঁর দেহে আঘাত করিয়া শস্যের সংস্থান করি, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তৃষ্ণার বারি সংগ্রহ করি, তাঁর রক্তে পুষ্ট বৃক্ষ লতাদি হইতে ফল মূল আহরণ করিয়া 'দেহের পুষ্টি সাধন করি! কিন্তু কৈ! এত অত্যাচারে তো মা আমার অধীর হন না! একবারও তো বলেন না, "ওরে! আর তো পারি না!" এমন মা কি আর হয়! কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? এমন মাকে আমরা পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। আমাদের অপরাধে আজ তিনি পরহস্তে বন্দিনী! দীনা, হীনা, উপবাস খিন্না শৃঙ্খলিতা মা আজ করজোড়ে সন্তানের নিকট মুক্তি চাহিতেছেন, এসময়ে মায়ের অর্দ্ধেক সন্তান যদি নীরব নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘরে বসিয়া থাকেন তবে কিসের তাঁরা সন্তান, আর কিসের তাদের মাতৃগৌরব! একবার ভাবিয়া দেখ কোন দেশের নারী তোমরা! যে দেশে সীতা সাবিত্রীর মত নারী সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশে গান্ধারীর মত জননী ধর্ম্মের মহত্ব প্রচার কয়িয়াছেন, যে দেশে দ্রৌপদীর মত নারী সেবার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে দেশে সুমিত্রা উর্ম্মিলার মত নারী ত্যাগের

মহিমা প্রচার করিয়াছেন সেই দেশের নারী তোমরা! যে দেশে রাজপুত রমণীগণ স্বামী পুত্রকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া সমরে পাঠাইতেন, আপন কেশ কর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিতেন, স্বামী পুত্রের পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিলে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতেন, আবার হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইতেন! সেই দেশেরই নারী তোমরা! যে দেশের নারীজাতি ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেন, ধর্ম্মের নিকট স্বামী পুত্র পিতা ভ্রাতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। দুর্য্যোধন গর্ভের সন্তান হইলেও যেদেশে জননীর মুখ দিয়া আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়' বাক্য বাহির হইয়াছিল, সেই দেশেরই মেয়ে তোমরা! পূর্ব্ব গৌরব কি বিস্মৃত হইয়াছ! মনে কি পড়ে না সে সব কীর্ত্তি কাহিনী—গৌরবে কি বুক ভরিয়া উঠে না! ধমনীতে ধমনীতে কি শক্তির সঞ্চার হয় না! কত শক্তি যে তোমাদের অন্তরে নিহিত আছে তার সংবাদ তো তোমরা জাননা! তোমাদের দেশ তো ভোগ বিলাসের দেশ নহে, তোমাদের দেশ যে ভক্তি প্রেম ও পুণ্যের দেশ! শিশুকাল হইতে ব্রত নিয়মাদির সংযম ও ত্যাগের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া যে শক্তির সঞ্চয় হইয়াছে তাহার বিকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই দেশের প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত, প্রত্যেক কর্ম্মে নারী শক্তির প্রয়োজন। এদেশে কোন ধর্ম্ম কার্য্যই নারী শক্তির সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। মাতার আশীর্ব্বাদ, পত্নীর সাহচর্য্য, ভগিনীর সহায়তা ব্যতীত পুরুষের শক্তি সম্পূর্ণ হয় না। এই জাতীয় যজ্ঞই বা কিরূপে তোমাদের সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে?

আজ দেশে যে তরঙ্গ দুকুল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে, সে স্রোতে জাতির জীবনতরী বাহিতে ভারত নারীর সমগ্র শক্তির সহায়তার প্রয়োজন। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া বিপদ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, নিন্দা অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া আজ ভারত নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

তবে এস ভারতের মাতৃজাতি! ফলাফল শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে এস! তোমার আর ভয় কি? পতি পুত্র যে পথে গিয়াছেন, সে পথ তো তোমার চিরপরিচিত পথ, তোমার ঈপ্সিত পথ! এস শক্তিরূপিনীগণ! পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে এস, শব সাধনার শক্তি সঞ্চার করিবে এস! যাহারা এখনও

নিদ্রিত তাহাদের জাগরিত করিয়া, কর্ণে সাধনার মন্ত্র দান করিবে এস! ঘরে ঘরে চরকা কাটিয়া দেশের বস্ত্র সমস্যা মিটাইবে এস! জাতীয় আদর্শের পুনরুদ্ধার করিবে এস! ঘরে ঘরে ত্যাগ ও সংযম ও পবিত্রতার শিক্ষা দিবে এস! বিদেশী শিক্ষার মোহ আবরণ দূর করিয়া ভারতবর্ষের সুপ্ত শক্তি জাগরিত করিবে এস! ভারতবর্ষের ভবিষ্যদ্‌বংশকে ধীর স্থির, অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ধীর করিয়া গড়িয়া তুলিবে এস!

তাই ডাকিতেছি, এসো মা! এস পত্নী! এস কন্যা! এস ভগিনি! যে মহান কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত তাহা মাথায় তুলিয়া লও। জীবন সার্থক করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। নিজের বিবেকের প্রতি, নিজের স্বামী পুত্রের প্রতি, নিজের জননী জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধন্য হও—ধন্য কর!

বাংলা ভাষার ইতিহাস

ভূমিকা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

বাংলাভাষার ইতহাস আজও লেখা হয় নাই। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাংলাভাষার প্রকৃত ইতিহাস কিছু আছে কি না—সে বিষয়ে আমার মত অল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলাভাষার ছোট্ট একটু "কুলজী" লিখিয়াছেন, কিন্তু বাংলাভাষার "কোষ্ঠী" লেখা এখনও পর্য্যন্ত বাকী আছে। কোন্ আচার্য্য সে কর্ত্তব্য সমাপন করিবেন, আজও তার ঠিকানা পাই না। কেবল মাত্র পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের History of the Bengali Language—"বাংলাভাষার ইতিহাস"—এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে কতকটা অর্থের সন্ধান দেয় মাত্র।

বাংলা ভাষার ইতিহাস জিনিসটা বুঝিতে গেলে—"বাংলা" জিনিসটা কি, "ভাষা" জিনিসটা কি, এবং "ইতিহাস" জিনিসটাই বা কি—তাহা বোধ হয়

আগেই বোঝা দরকার। "বাংলা" এবং "ভাষা"র কথা পরে বলিব। "ইতিহাস" কথাটির বেশ একটু মজার ইতিহাস আছে। সংস্কৃত—"ইতি হ আস"—"এই-ই-ছিল"—"ইহাই ছিল"—এই তিন শব্দ লইয়া "ইতিহাস" কথাটি রচিত। সুতরাং ইতিহাস লিখিতে গেলে, যেটুকু ছিল কেবল তাহাই যথাযথ বলিতে হইবে—অজ্ঞতা প্রযুক্ত কল্পনার রঙে রঙিয়ে ছবিখানি আঁকিলে চলিবে না।

বাংলাভাষার বর্ত্তমান পরিণতির ইতিহাস বুঝিতে গেলে গোড়া হইতে সব কথা আলোচনা করিতে হইবে। বাংলার সহিত ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কি সম্বন্ধ তাহাও বুঝিতে হইবে। আবার ভারতীয় ভাষাগুলি জগতের ভাষা সমূহের সঙ্গে কি ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে আসিয়া পড়িবে। তারপর আসলে "ভাষা" জিনিসটাই বা কি—তাহার স্বরূপ, পরিণতি ইত্যাদি কথা না জানিলে, বাংলার ভাষার ইতিহাস বুঝার সুবিধা হইবে না। তাই আমার আলোচ্য বিষয়কে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইব।

(১) অবতরণিকা—"ভাষা" ও "ভাষাবিজ্ঞান" সম্বন্ধীয় কথা
(২) জগতের ভাষা সমূহ—
(৩) ভারতীয় ভাষা সমূহ—
(৪) বাংলা ভাষা—

আবার বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার জন্য ঐই চারিটি বিভাগকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করিয়া লইব :—

১। অবতরণিকা

১—নাম—ভাষাতত্ব, ভাষাবিজ্ঞান
২—ভাষাতত্বের ইতিহাস
৩—ভাষার স্বরূপ

২। জগতের ভাষা সমূহ

৪—জগতের ভাষা সমূহের শ্রেণী বিভাগ
৫—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহ
৬—ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা সমূহ—আর্য্য ভাষা

৩। ভারতীয় ভাষা সমূহ

৭—আর্য্য ও অনার্য্য ভাষা
৮—দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহ

৯—ইন্দো-আর্য্য ভাষা সমূহ
১০—বৈদিক, পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষা
১১—"বাইরী" ভাষা সমূহ ও "ভিতরী" ভাষা সমূহ
(Outer group and Inner group of indo Aryan Vernaculars)
১২—আসামী, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দী (উর্দ্দু)

৪। বাংলা ভাষা

১৩—বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি
১৪—বাংলা ভাষা
১৫—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা
১৬—বাংলার অপভাষা ('ভাষা'—dialects)
১৭—বাংলাভাষায় বিদেশী উপাদান
১৮—বাংলা বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি (syntax)
১৯—বাংলা বিভক্তি প্রত্যয়াদির ইতিহাস (morphology)
২০—বাংলা ধ্বনিতত্ব (phonetics)
২১—বাংলা অক্ষরের ইতিহাস (Palaeography)
২২—বাংলা উচ্চারণ এবং ছন্দ (Accent and metre)
২৩—বাংলা শব্দার্থ তত্ব (semantics)

উল্লিখিত ভাবে এক সঙ্গে সুবিধামত এক বা ততোধিক বিষয় লইয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। উপাদান সংগৃহীত আছে—কেবল গুছাইয়া লিখিতে হইবে। আশা করি সমস্তগুলি প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অনেক সুবিধা হইবে এবং আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ও অবসরযুক্ত কেহ এ বিষয়ের আলোচনার ভার গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার একটি প্রধান অভাব মোচন করিবেন!

বঁধু-বিরহে।

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল]

ওগো মোর দুখের নাহিক ওর !
মরমে পশিয়া সিঁদ-কাটি দিয়া চিত্ত হরিল চোর।
বিম্বাধরের বিভ্রম ভাবি অন্তরে বাড়ে তৃষা,
স্মরি বেণু-তান বিগলিল প্রাণ, হরষে না পাই দিশা।
নিমেষে যখন ছুটে সে স্বপন নয়নে উথলে লোর,
দুখের দহনে দহি নিশিদিন জানি না কি হবে মোর !

* *

এ মম মানসে চপলার মত চমকি পলাও আকুলি প্রাণ,
কত দিনে তব মধু-মূরতিতে দিবে দিবা নিশি দরশ দান ?
কত দিনে আর আঁখি রসায়ণ
বিনোদ কিশোর ওরূপ মোহন
লুব্ধ মুগ্ধ এ দুটি লোচন
অধীর পিয়াসে নিমেষে নিমেষে চকোরের মত করিবে পান ?

* *

ওহে নাথ তাপহারি !
অতি অসহন অতি অকহন
জ্বলন্ত তব বিরহ-দহন
পশিয়া ধসিয়া নিখিল মরম চেতনা না নিতে কাড়ি
চন্দ্র-বদন-বিতানে তোমার
কর আবরিত চিত্ত আমার
সন্তাপ-হরা স্মিত-সুধা-ধারা পরতে পরতে ঢারি।

* *

ঘিরিছে আমারে একিরে বিকার !
গভীর তিমির ইন্দ্রিয়-দ্বার
করিছে বুঝিবা বন্ধ !

এ কি নিদারুণ দশা অভিনব
চিত্তে আমার আনে অভিভব,
নয়ন হ'ল কি অন্ধ ?
না হ'তে বধির শ্রবণ-বিবর
নাচুক্ তোমার মুরলীর স্বর
তুলিয়া মধুর ছন্দ ;
না নিভিতে মোর নয়নের আলো
লীলাময়ি ! তব লাবণ্য ঢালো
উত্তোলি মুখ-চন্দ !
কলঙ্ক তব ঘোষিবে ভুবন
ঘটে যদি নাথ ! দাসীর মরণ
না হেরি নয়নানন্দ !

* *

তবে কি বন্ধু আসিল ?
করুণা সিন্ধু টলিল ?
মনে কে তুলিল লহরী ?
বনে কি বাজিল বাঁশরী ?
মুরলীর রসে রসিয়া
মণি-মঞ্জীর রণিয়া
তালে তালে তুলি অগ্র চরণ
নয়নের ক্ষুধা করিতে হরণ
সমুখে কি সখা ! দাঁড়ালে ?
জনমের জ্বালা জুড়ালে !
জীবনে সুখের বাকি কি ?
বঁধু হে, খুলিব আঁখি কি ?

*

একি ! কোথা তুমি লুকালে !
কূলে আনি তরী ডুবালে ?

* *

হে মোর দেবতা! হে মোর দয়িত! ত্রিভুবনে এক বন্ধু হে!
হে রস-আধার! তৃষিত জনার করুণার সুধা-সিন্ধু হে!
হে নাথ রমণ! নয়ন-রঞ্জন! হে মোর চপল রসিক হে!
কত দিনে আর হ'বে গো আমার লোচনের পথে পথিক হে!

* *

দস্যুর মত বিরহ তাহার
দেহের সকল শকতি আমার
নিয়েছে কাড়ি,
ধরণী-শয়ন ছাড়িয়া চরণ
তুলিতে নারি!
দৈবে যদি বা এমন সময়
ভাগ্যের ধন আসে রসময়
সমুখে মোর,
বুঝিবা তাহারে না পারিবে আর
বাঁধিতে বক্ষে বিবশ আমার
বাহুর ডোর!
বঁধুয়ার মম তরুণ তরল
দেখিতে দিবে না বদন-কমল
নয়ন-লোর!

* *

বুঝি এ জীবনে এ পোড়া নয়নে ঘটিল না দরশন!
পরজনমের কঠোর সাধনে
পাব কি দেখিতে কমল-বদনে
ভরি মোর দুনয়ন!
মুখ-পঙ্কজ কি বা সুন্দর
অরুণ অরুণ ওষ্ঠ অধর
হাসিটি লাগিয়া তায়,
সে অধর সুধা বহে বেণু-গান
শ্রবণে গগন ভুবন পরাণ
হৃদয়ে গলিয়া যায়!

আধ-বিকশিত বিলোল লোচন
বিভ্রমভরে ভুলায় ভুবন
পরাণ বিকাতে চায়!
এমন মাধুরী যুগে যুগে ঘুরি কভু কি দেখিব হায়?
লীলায় চপল রসেতে শীতল কমললোচন কি বা!
নীল তারা তায়, প্রান্তে লুটায় উষার অরুণ বিভা।
ঘুরায়ে ঘুরায়ে সে দুটি নয়ন
করুণ কিশোর হেরিবে বদন—
উদিবে কবে সে দিবা?
বকুল চাঁচর চিকুর মাথে
বাঁকা শিখি পাখা চূড়াটি তাতে,
চপল চপল লোচন কি বা
বিম্ব জিনিয়া অধর-বিভা
মৃদুল মৃদুল তরল হাস
বঁধুর মধুর বেশ বিলাস
মন্দার সম মথিয়া মন
ধৈরজ- ধন করে হরণ!
হা হা বঁধু! মধু-মাধুরী তোর
ঢুঁড়িছে পাগল নয়ন মোর!

* *

সে যে রে চতুর চোর!
নীরদ-কান্তি, মরাল-গমন,
খঞ্জন-মীন-হারণ-লোচন
চন্দ্র বদন-মাধুরী মোহন
হরিল বঁধুয়া মোর!
মধুর মধুর তাহার বদন—
মাধুরীতে যবে মগন নয়ন
সেই অবসরে চুরি করি মন
লুকাল কিশোর রাজ;

কত দূরে আর করিবে গমন ?
দয়িতার আঁখি করিতে স্মরণ
অলস চরণ জড়ের মতন
দাঁড়াবে কানন মাঝ !
যদি দূরে যায়, ময়ুর-মুকুটে
পড়িবে সে ধরা নয়নের পুটে,
কেমনে গোপন রবে,
আঁধিয়ার বনে অঙ্গ কিরণে
বঁধুরে চিনিব সবে !

সুখের ঘরগড়া

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

মাণিক বাহিরে আসিয়া বরাবর জীবন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। জীবন তখন ইশেন হালদারের সঙ্গে কি কথায় ব্যাপৃত ছিল। মাণিক গিয়া সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত জীবনের কাছে জানাইল। জীবন বেশ একটু মুরুব্বীয়ানা ধরণে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিতে যাইবে এমন সময় তর্ক সিদ্ধান্ত বাড়িতে আসিয়া হাজির। মাণিককে দেখিয়া বলিলেন ;"কি হে মাণিক ও বাড়ী পুজা সেরে এলে ?

মা। আজ্ঞে না ! গিয়ে দেখি আপনার ভাগ্নে কাজ সেরেছেন—

ত। কেন ? তুমি যাওনি ?

মা। আজ্ঞে যেতে দু চার মিনিট দেরী হয়েছিল বৈতো নয় ; তবে কিনা আমাদের মত পুরুতের কাজে কি ওঁদের মন উঠ্‌বে—' আপনাদের মত পণ্ডিত পুরুৎ যদি ওরা পায় তা হলে আর— ।"

তর্ক সিদ্ধান্ত মাণিকের এই অপ্রত্যাশিত বাকপটুতায় অবাক হইলেন। মাণিক তর্কসিদ্ধান্তের ছেলের বয়সী। তাহারি টোলে সে কয়েক দিন মুগ্ধবোধ মুখস্থ ও স্মৃতির বুকনি সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু: সরস্বতীর অকৃপা বশতঃ

ব্যাকরণ বাগ মানিল না, এবং স্মৃতি বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়িল, কাজেই এ বালাই ছাড়িয়া দিয়া সে খুড়ার কাছে নিত্য পূজাপদ্ধতির কয়েকটা কাজ চালান মন্ত্র তন্ত্র শিখিয়া নিয়া কৌলিক পৌরহিত্যের পেশা ধরিল ; বাকী সময়টা ঘুনী ও জাল বোনা শিখিয়া মৎস্য বধ কার্য্যে ব্যয় করিত। মাণিকরাম তর্কসিদ্ধান্তকে যেমন সবাই ভয় ভক্তি করিত, তার অধিক ভয় করিত, ভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কারণ ছাত্রাবস্থায় সে সিদ্ধান্ত হাতে প্রাণান্ত ভৎ'সনা লাভ করিত। এই মাণিকরামের মুখে ইদৃশ বিদ্রূপ রসাত্মক বাক্য শুনিয়া সিদ্ধান্ত মহাশয় সত্যই স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না কোন খেলোয়াড়ের যাদু মন্ত্রে হেলে শাপ ফনা তুলিতেছে। এক অসহায়া বিধবাকে তাঁহার দেবী দুর্ল্লভ গুণের জন্যই যে কুচক্রী পাঁচ জনের হাতে অকারণে এমন বিপন্ন হইতে হইতেছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার ব্রহ্মণ্য রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইল। তার পর একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন "ভেলারে মাণিকরাম, কে বলে মাণিক কথা কইতে জানে না।" তারপর তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনজনেই কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ষোড়শ অধ্যায়—

ভোলানাথ গত দিন অপরাহ্নে একটা ভাসা ভাসা রকমের গুজব শুনিয়াছিল যে চৌধুরী মহাশয় নাকি ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া বলিয়াছেন যে ভোলানাথের মেয়ের ভাতে সকলেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিৎ। তাহার একটু আশ্বাস হইয়াছিল, কেননা সে কোন এক সময়ে লুকাইয়া গিয়া জমিদার রতনরায়ের শরনাপন্ন হইয়া তোষামোদ ও অনুনয় বিনয় করিয়া ধরিয়াছিল এ সংকটে তাহাকে বিপন্না না করা হয়। রতনরায় স্তবে তুষ্ট হইয়া ভোলাকে অভয় বর দেন। ফলে চৌধুরীও তস্য মণিবের গোপন পরামর্শে স্থির হইয়াছিল যে ভোলানাথ রূপ নিরীহ মেষ অবধ্য, রায়সিংহের ক্রোধ যোগ্যই নহে। যত দোষ ওই কুটীল-মতি দুর্ব্বাসারূপী তর্কসিদ্ধান্তের। উহাকে যেন তেন প্রকারেণ জব্দ করিতেই হইবে। আর ভোলানাথের ভ্রাতৃদ্বয়ের অহিন্দু আচরণের জন্য তাহাকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তার যথাযোগ্য মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ অগ্রিম ধরিয়া দিতে হইবে। তবে তর্কসিদ্ধান্তের সম্বন্ধে এই যে মৎলব তাহার সফলতা সাধনে ভোলাকে সাহায্য করিতে হইবে এই সর্ত্ত—ভোলানাথকে উপস্থিত সংকট

হইতে উদ্ধার করা যাইবে, এ কথা তাহাকে বঝান হইল। ভোলানাথ স্বভাবে কাপুরুষ ও প্রবলের আশ্রয় পরায়ণ, গ্রামে তার মত ক্ষীণপতঙ্গকে যে প্রবল প্রতাপ আশ্রয়দাতার রোষবহ্নিতে পড়িলে মুহূর্ত্তে ভগ্ন হইতে হইবে এ ভয় তাহাকে সর্ব্বদা আড়ষ্ট করিয়া রাখিত, অথচ এই ভয় ও কাপুরুষতা সে মেয়ে মহলে জানাইতে পারিত না ; বিশেষ যখন তাহারই আত্মীয় একজন অনাথা অবলা বিধবা তাঁহার মনের দার্ঢ্য ও তেজ এমন ভাবে দেখাইতেছেন তখন তাঁহার কাছে নিজ দৈন্য প্রকাশ হইতেই পারে না। ভোলা সম্মত হইল, তবে সাক্ষাৎ ভাবে কায়বাক্যে সে তর্কসিদ্ধান্তের শত্রুতা করিবে না ; তবে বন্ধুত্ব করিবেন না ইহা সে প্রতিজ্ঞা করিল ; তাহার মৌন সম্মতি ও নীরব ব্যবহার যতটা পারে ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করুক তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।

ভোলার প্রতি রতনরায়ের এই ক্ষমাপ্রদর্শন মহেশের মনোগত ইচ্ছানুকূল ছিলনা ; তাহার কারণ সে ভোলানাথকে জব্দ করিতে চায়। উদ্দেশ্য গভীর। তারামণির প্রতি মহেশের যে জঘন্য অভিসন্ধির আভাষ আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি তাহাই ইহার মূল। মহেশের মনে মনে বিশ্বাস ভোলানাথ তারামণির প্রতি গোপনে গোপনে আসক্ত ; এই আসক্তিকে আলোচালের নৈবেদ্যের উপর ভেড়ার লোভদৃষ্টি রূপে সে একবার ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করে। মহেশ একবার কথায় কথায় ঈর্ষ্যাপ্রাবল্যফলে ভোলাকে ঠারে ঠোরে ঐ বিষয় লইয়া তামাসা করে ; ভোলা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করে। তদবধি মহেশের মন কতকটা সুস্থ হইলেও সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক হয় নাই। মহেশ এরূপ একটা ধারণাও ভোলার মনে জন্মাইয়া দেয় যে তারামণি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠেরই কাম্য বস্তু, তাহাতে সামান্য ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা লোভীর পক্ষে প্রমাদকর। ভোলানাথ না বুঝিয়াও বুঝিবার ভাণ করে।

সম্প্রতি পূর্ব্বদিনের রাত্রিতে এমন এক ঘটনা ঘটে যাহাতে মহেশের পূর্ব্ব ঈর্ষ্যা প্রবলতর মাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। ঘটনাটা সামান্য। কিন্তু ঈর্ষ্যার মন তুচ্ছকে ফাঁপাইয়া তিলকে তালে পরিণত করে। যজ্ঞবাড়ীর তরকারী কুটিবার জন্য তারামণি মনিব বাড়ী হইতে রাত্রি ৮টার সময় ছুটী করিয়া কোলের ছেলেটী লইয়া ভোলানাথের বাড়ী আসে। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কুটনা কুটিয়া আর বাড়ী না ফিরিয়া সে যজ্ঞেশ্বরীর কাছেই নিদ্রা যায়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সে ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসে।

…দৈবের ঘটনা রোধ করে কে ? মহেশ চৌধুরী সেই পথ দিয়া নিকটবর্ত্তী

তালিবপুর গ্রামের কাছারী পরিদর্শন করিতে যাইতেছিল। দুজনের চোখোচোখি হইল। মহেশ একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল "একি হে মাষ্টার! কোথায় চলেছ ?" হাসির অর্থ ভোলানাথ যে বুঝিলনা তাহা নহে ; অপরাধ না করিয়াও তাহাকে যে অপরাধীর মত জবাব দিহি করিতে হইবে ইহাতে সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল "তারামণি কাল আমাদের বাড়ীতেই ছিল, কুটনো বাটনা করতে রাত হয়ে যায় কাজেই বাড়ী ফিরতে পারেনি আজ তাই পৌছে দিতে চলেছি।" "তাইনাকি ? তা মন্দ না ভাল ভাল"—বলিয়া মহেশ চলিয়া গেল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা ভোলানাথকে ভালরকমই বিঁধিল। সে একটা অনির্দ্দেশ্য ভয়ে মুখ ফিরাইয়া পিছনে তাকাইল ; দেখিল মহেশও তাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছেন।

মহেশের পাপের মন ; সন্দেহটা এই দৈবদৃশ্যে আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল ; বাড়ী ফিরিয়াই সে জীবন ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া সকালের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। আগুন উঠিলে বাতাস তাহার সহযোগী হয় এবং রাজ্যের খড়কুটো উড়াইয়া আনিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগায়। সহচরটী মহেশের সন্দেহটীকে পাকাইয়া তুলিল। "বলেছিতো পিসেবাবু মাষ্টার ডুবে ডুবে জল খাবার একজন! সাহস বটে বাবা"। বন্ধুর উৎসাহে ভোলানাথের প্রতি মহেশের পূর্ব্বে জিঘাংসা দ্বিগুণ বলে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে যে ইহার সমুচিৎ ফল দেওয়া উচিৎ তাহা দুই জনেই স্থির করিল। তারপর সেদিন জীবন ও ঈশান যখন অপমানিত মাণিকলালকে লইয়া মহেশভবনে উপস্থিত হইল এবং মাণিকের ইতিবৃত্ত মহেশকে শুনাইল তখনই মহেশের মাথায় ভোলানাথ এবং তর্কসিদ্ধান্তরূপ দুই পক্ষীকেই এক ঢিলে মারিবার ফন্দী জুটিয়া গেল। জমীদারী চালানো মাথার উর্ব্বরতা মহেশের যথেষ্ট ছিল। মাণিকের এই অপমান প্রতিশোধচ্ছলে যে তাহা সহজে সিদ্ধ হইতে পারে মহেশ পার্শ্বচর দুটীকে জলের মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দিল।

ঘটনা শুনিয়াই চৌধুরীর মুড়া অর্দ্ধপক্ক গোঁপের আড়ালে একটী হাসির বাকা রেখা খেলিয়া মিলাইয়া গেল। কয়েক মিনিট কি একটা ফিস্ ফাস্ করিয়া চৌধুরী বলিলেন—"চলহে ভট্‌চাজ ফলার খেতে যাই। ভোলা আমাকে এস্‌পেশাল নেমন্তন্ন করেছে—"। পিসেবাবুর আশ্রিত বাৎসল্য দেখিয়া ঈশান ও জীবন মুগ্ধ হইয়া গেল।

যথাকালে দু এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোলানাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত

হইল। প্রত্যেকেরই সঙ্গে ছেলে মেয়ে আধডজন করিয়া। এমন কি দুতিন বছরের দুগ্ধ পোষ্যও বাপ-ভাই মামা মেসোর কাঁধে ও কোলে চাপিয়া আসিতে ছাড়িল না।

নবীন চক্রবর্ত্তী ও হৃদয় গাঙ্গুলী সর্ব্বাগ্রে আসিয়া আসর জমকাইয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। মাণিকের অপমান কাহিনী দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নবীন ও বিজয়ও তা অবগত হইয়াছিল। জয়রাম চাটুয্যে আসিয়া সেই কথা উত্তাপন করিল। জয়রাম মাণিকের 'পৃথগান্নভোজী খুড়-তুতো বড় ভাই; ইনিও ভোলানাথের পুরোহিত। বৎসরে ছয়মাস ইহারা করেন যজমানী, বাকী ছয়মাস করে মাণিকরাম। মাণিকের যজমানী হাত ছাড়া হইলে উঁহারই সে কাজ লাভ হইবে এই তাঁর গোপন আশা—কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত যদি সেই পাকা ফলে লোভ বসান তাহা হইলে সমূহ আশঙ্কা; এই জন্যই সে ব্যাপারটার অধিক খবর জানিতে নবীন ও বিজয়ের শরণাপন্ন হইল। জ্ঞাতিশোকসুলভ আনন্দ চাপিয়া মৌখিক দুঃখ ও আক্রোশ জানাইয়া বলিল—"তোমরাই বিবেচনা করে দেখ ভায়া, উনি হলেন একজন দিগ্‌গজ। পণ্ডিত, উনি যদি আমাদের মত গরীব গুর্ব্বার অন্ন মারতে বসেন বিবেচনা কর তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা"—নবীন ডাবা হুকায় তন্মন নিয়োজিত করতঃ ধূম্রলোক রচনা করিতে করিতে নালিশ শুনতেছিল জয়রামের কথা শেষ হইলে একটা প্রচণ্ড বেদম সুখ টান টানিয়া বাহাতে হুকার মুখ মুছিয়া ডাইন হাতে উহা জয়রামের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—"অবিশ্যি, তা আর ভুল কি! ওটা কি ওর জুগ্‌গি কার্য্য হল শাস্ত্রেই বলেছে যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞং মিত্র উক্তং ন করোন্তি য স এব নিধনং যাতি যত্র মন্থর কৌলিক।" তখন বলেছিলাম মাণিক বাবাজী একটু ল্যাখাপড়া শিখে পিতৃমুখ উজ্জ্বল করো বাবা চাপে কাটার চেয়ে ধারে কাটা ভাল—তা বিদ্যালাভ না করে পুরুহিত্য কার্য্য বড় কঠিন—তা আমিতো বলি এর একটা বিহিত হওয়া উচিৎ ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এর অপমান হওয়াটা ভাল কি?

রিদয় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"নিশ্চয়ই মা—স্বজাতি হল মাণিক, পরাণ বিত্তেলংকারের বেটা তাকে ফেলে এ বাড়ীতে পাতা পাতা কি আমাদের উচিৎ সে বোধ হয় আসছেনা খেতে— জয়রাম ধুম ছাড়িয়া বলিল কি করে আসে বল, বিবেচনা কর আত্মসম্মান তো ভাসিয়ে দিতে পারে না? আমরা না হয়—নবীন বলিল "এসেছি যে সে শুধু রাজাদিষ্ট অমান্যকর করতে

পারিনি বলেইতো নচেৎ কিনা ফলারের লোভে—অবিশ্যি কিনা রিদয় ভায়া?"

এইরূপ আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তথায় মহেশ চৌধুরী ইশান ও জীবন আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরো জন ২০।২৫ ব্রাহ্মণ পুঙ্গব আসিয়া পড়িলেন। চৌধুরী মহাশয়কে দেখিয়া নবীন ও জয়রাম পরম উৎসাহে সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিল। সভাস্থ সকলেই শুনিল ও জানিল ব্যাপার খানা কি। মহেশ কিয়ৎক্ষন গম্ভীর থাকিয়া বলিল "মানিকরাম আসেনি?" সকলেই সমস্বরে বলিল "না না"। এ ক্ষেত্রে কি তার আশা কর্ত্তব্য বলেন বিবেচনা করুন অসম্মানটা কতদুর আবার মুখুজ্যে গিন্নি না কি বলেছেন যে চালকলা বাঁধার ব্যবসাদার, বাউন তুমি তোমার কথা আলাদা—"। মহেশ ভোলানাথের খোঁজ করিল। ভোলানাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত ভাবে অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল। মহেশের কথায় সভায় উপস্থিত হইল।—মহেশ বলিল কি হে মাষ্টার! আবার কি কেলেঙ্কারী করে বসেছ?" আমি করি না কপালে করে চৌধুরী মশাই যা বলুন! এখন আমিই দোষী।"খুবই একটা তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটী হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ভোলানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! মাত্র আধ ঘণ্টা আগে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদলের আগমন দেখিয়া ভোলানাথ ও যজ্ঞেশ্বরীর খুব সাহস ও আশ্বাস বাড়িয়াছিল এবং উভয়ে পরম উৎসাহে কাজ করিতেছিল, কিন্তু এই আকস্মিক উৎপাতে ভোলানাথ বিলক্ষণ দমিয়া গেল। তাহার মনে হল আসন্ন ঝটিকার সূচনা স্বরূপ দিগন্তে একটা কালো-মেঘ মাথা উঠাইয়া উঠিতেছে। একটা যে গুরুতর কিছু না ঘটিয়া দিবাবসান হইবে না এই ভয় দেবর ভাজকে পাইয়া বসিল। যজ্ঞেশ্বরী……বাহিরের কোলাহল শুনিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিলেন; সঙ্গে দক্ষ ঠাকুরাণী ছিল। উভয়ে বাড়ীর ভিতর গেলে দক্ষ ঠাকরুণ বলিলেন "কিছু না বৌমা! ও ওই বিটলে বাউনের একটা চাল্। মান্‌কের সাহস কি বৌমা কি যজমান চটায়? শিবের মাথায় চাপ্‌লে ঢোঁড়াও ফণা ধরে।" দক্ষ দেবী খুব চতুরা এবং ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে খুব মজবুৎ। তিনি খিড়কী দিয়া ছুটিয়া গিয়া তর্কসিদ্ধান্তকে খপর দিলেন; সিদ্ধান্ত সেই মাত্র পুজা সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন দক্ষ প্রমুখাৎ ব্যাপার শুনিয়া সেই বেশেই অকুস্থানে হাজির হইলেন; পঞ্চুও মামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত।

আর একজন আসিতে ইচ্ছুক হইয়াও আসিতে পারিলেন না; ভবানী প্রসাদ! ভবানী ঘণ্টা খানেক আগে আসিয়া বিজয়ের সহিত বাটীর ভিতরেই তার শয়ন গৃহে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। বাহিরের ঘরে তেমন বসাইবার ভাল স্থান না থাকাতেও বটে আর তিন বন্ধুতে মিলিয়া নির্জ্জনে আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছাতেও বটে বিজয় তাহার শয়ন ঘরে শয্যায় ভবাণীকে বসাইয়া আলাপ সম্ভাষণ করিতেছিল। যে সময়ে গোলমালটা ঘটে তখন ভবানী জলযোগ করিতেছিল; বিজয় বিজয়ের মা নাছোড়বন্দা হইয়া তাহাকে ও পঞ্চুকে জল খাওয়াইতে রাজী করেন; পঞ্চুর তখনো স্নান না হওয়াতে সে বাড়ী যায়; বিলম্ব হইবে বুঝিয়া ভবানীকে অগ্রিম কার্য্য সম্পাদন করিতে বলিয়া যায়। ভবানী তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিতে লাগিল। সে দলাদলি ব্যাপারটা পূর্ব্বেই কিছু কিছু নয়নতারার কাছে শুনিয়াছিল।

হাফিজের কাব্যরহস্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এ ম্ এ]

বি নায়দেম্ নিশানে জে জামেলে দস্ত্ লেকিন্
দো জাহান্ বাহুম্ বার্ আয়াদ্ শের্ ই-শোর্-ও শার্ নাদারম্ ॥

আমি আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র দেখাইতাম কিন্তু ভয় হয়—পাছে দ্যুলোক ভূলোক আত্মহারা হইয়া পড়ে! (আমি তোমাকে একটা আভাস—একটা ছবি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার সৌন্দর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিবে কি?)

১

আদর্শ কবিতার লক্ষণ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে প্রকাশ করা। সমস্ত ললিত কলারই ঐ এক আদর্শ। স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত কবিতা মনের গোপন ভাবটীকে আকার দিয়া চির স্থির করিয়া রাখিতে চায়। মানব জীবনের যেমন তিন অবস্থা, আদর্শ কবিতাও তেমনি তিনটী সোপানের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে,—শৈশব, যৌবন ও পরিণতবয়স

প্রথম অবস্থায় বা শৈশবে কবিতা সরল ও নীতিমূলক হইয়া থাকে। এই জাতীয় কবিতায় যুগধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের সাধনা বেদের সরল মন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার প্রথম যুগে এই জাতীয় কবিতা শৌর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি মানবীয় সদ্গুণগুলির পূজাতেই অনুপ্রাণিত! ইস্লাম ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্ববর্ত্তী স্যামুয়েল ও পরবর্ত্তী রোদাকি, আন্সারি এবং কির্দ্দুশী প্রভৃতি পারসী কবি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কির্দ্দুশী একটা সরল কবিতায় বলিতেছেন—

খুদাওয়ান্দে বালা ওয়া পস্তি তু-ই।
নাদাণাম্ চে-ই, হার্চে হস্তি তু-ই ॥

(হে দেবতা, তুমি উচ্চে আকাশের রাজা, নিম্নে ধরণীর রাজা। জানি না, তুমি প্রকৃত কে, কিন্তু তুমি যে-ই হও, আমি শুধু এই মাত্র জানি যে তুমি আছ)। সারল্যে সুন্দর, অভিব্যক্তিতে স্বচ্ছ এই ক্ষুদ্র কবিতাটী নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জীবন গঠনেরও একটা ক্ষীণ আভাস দিয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগে বা যৌবনে এই কবিতা সভাবতঃই জটিল ও সৌন্দর্য্য-রস-সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন ইহা আপনার মাঝে আপনি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ভাষাসম্পদে ও বর্ণনা-লালিত্যে তখন ইহা স্ফুটনোন্মুখী কিশোরীর ন্যায় অলঙ্কার বাহুল্যে পীড়িতা রূপকে ও কল্পনায় তখন ইহা মাধবী পূর্ণিমার ন্যায় আবেশময়ী। প্রথম যুগের কবিতা যেমন আমাদের প্রাথমিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হয়, দ্বিতীয় যুগের কবিতা প্রধানতঃ আমাদের অন্তর-দ্বারে করাঘাত করিয়া সুপ্ত বাসনারাজি জাগাইয়া দেয়, জীবনের যামুন-প্রবাহে উজান বহাইয়া দেয়। মরণের মধুর স্বপ্ন চক্ষের পল্লবে শিশির-কণার মত মাখাইয়া দেয়। জয়দেবের ভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা 'মৃগমদ-সৌরভ-রভসে' মহিমময়ী। প্রথম যুগের কবিতা অপেক্ষাও এই যুগের কবিতা আদর্শে গরীয়সী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার আদর্শ মুক্তার মত শুক্তি-গর্ভে আচ্ছন্ন ও প্রসুপ্ত বটে, কিন্তু সে শুক্তির কঠ-আবরণ শঙ্খ-ধবল ও মসৃণ। এই আদর্শেই দান্তের সুবর্ণ-স্বর্গ ও অন্ধকারময় নরক গঠিত হইয়াছে, আবার ইহারই আদর্শে সাদি, আন্ওয়ারি, সুল্মান্ সোরাজি প্রভৃতি সৌন্দর্য্য—রসিক পারস্য কবিগণের সলাম কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর তৃতীয় যুগ—বা কবিতার উচ্চ পরিণতির কথা।

কবিতা তখন গুণ ও অধ্যাত্মমূলক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তখন যথার্থ আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়া মাটীর বাঁধন নির্ম্মোকের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে। আপন সত্বা ও পৃথিবীর চতুঃসীমা ছাড়াইয়া তখন ইহার প্রভাব বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গের অমর মহিমার পানে ইহা ভ্রূক্ষেপ করে না, পূজা পদ্ধতির প্রাণহীন ধর্ম্মে ইহা আপনাকে ধরা দেয় না ঈর্ষ্যা-নিন্দার কুটিল কটাক্ষে ইহা সংকুচিত ও অবনত হইয়া পড়ে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কবিতার ও কবির সংখ্যা অনেক পরিমাণে কম। কিন্তু সেই অল্প সংখ্যক কবির প্রত্যেকেই সত্যদর্শী, ঋষি-কল্প ও যথার্থ কবি। কবিতা তাঁহাদের হৃদয়ের ছায়াচিত্র, মস্তিষ্ক প্রসূত শুষ্ক সিদ্ধান্ত মাত্র নহে। কবিতা তাঁহাদের ভাযাভাবের, ধ্যান ধারণার প্রকৃষ্ট পরিচয়। সেই জন্যই এ শ্রেণীর কবিতার পাঠক সংখ্যাও খুব অল্প। এই শ্রেণীর কবির মধ্যে জগতের শিক্ষক মহম্মদের জামাতা আলি, সাম্স্তাব্রেক, মৌলানা জালালুদ্দীন্ রুমি, হাকিম সানাই, জামি, ফারিরুদ্দীন্ আট্টার্, ও এই প্রবন্ধের আলোচ্য কবি শেখ আব্দুল্ কাদির্ জিলানি হাফিজ, বা খাওয়াজা সাম্সুদ্দীন্ মহম্মদ-ই হাফিজ, বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের কাব্য-ভাণ্ডার অফুরন্ত,—ইহাদের দর্শন-বাদ মরণের ভবিষ্য আঁধারে কুহেলি-সমাচ্ছন্ন নহে। যদি প্রথম যুগের কবিতা দুগ্ধ বা মধু-ধারার সহিত এবং দ্বিতীয় যুগের কবিতা মদিরার সহিত উপমেয় হয়, তাহা হইলে বলিব—তৃতীয় যুগের কবিতা সঞ্জিবনী সুধার সহিত উপমেয় প্রথম যুগের কবিতা আমাদিগকে আনন্দ ও নীতিশিক্ষা দেয়, দ্বিতীয় যুগের কবিতা আমাদের মনে প্রেম ও প্রীতির উন্মেষ করে আর তৃতীয় যুগের কবিতা আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত ঝরিয়া দেয়। ঘরের বাঁধন তখন আর আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না ; জীবন রহস্যের সমাধান তখন সহজেই হইয়া যায় ; সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের শান্তিচ্ছায়া তখন 'ঘন শ্রাবণ মেঘের মত' রৌদ্রদগ্ধ জীবনের উপর 'রসের ভারে নম্র নত' হইয়া পড়ে। হাফিজের দুইটী গজলের দ্বারা আমরা তৃতীয়োক্ত শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতি বিশদ করিয়া দিব ;

খুর্রম্ আন্ রোজ্ কাজিল্ মঞ্জিল্, উইরন্ বিরাওয়াম্।
রুহ্তে জান্ তালাবাম্ ওয়াজ্ পৈ জানাম্ বিরাওয়াম্॥
বা হাওয়া দারি-ই-উ জারবা শিফৎ রাকস্ কুনান্।
তালাবে চাশ্মি মুর্শিদ্ দারাক্সান্ বিরাওয়াম্॥

(যে দিন আমি এই নির্জ্জন পান্থ-নিবাস ত্যাগ করিব, কতদূর সেই দিন

—কতদূর সেই দিন, যখন আমি পরম সুখে আমার প্রিয়তমের পানে ছুটিয়া যাইব—যখন তাঁহার ভালবাসার আলোকে মুগ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণে ধূলিকণায় মত ভাসিতে ভাসিতে আমি সেই উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট পৌছিব !) বিরহ প্রতীক্ষায় উদ্বেগাকুল কবি ভগবানের পদে আত্ম নিবেদন করিতেছেন ; এইখানে বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতির সেই অমর শ্লোকটী মনে পড়ে—

"এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়নু
দিবস দিবস করি মাসা,
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়ায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা !
বরিখ বরিখ করি সময় গোঁয়ায়নু
খোয়নু এ তনু আশে—"।

আমাদের মনে হয়, প্রেমের সখীও দাস্যভাব ইহা অপেক্ষা সহজ সুন্দর হইতে পারে না। অন্য একটী শ্লোকে হাফিজ্ নিরর্থক পূজাপদ্ধতি ও সমাজ শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—

কাশ্মি গোইম্ ও আজ্ গুকৃতি খুদ্ দিল্শাদাম্।
বন্দী ইশ্কোয়াম ও আজ্ হার্দো জাহান্ আজাদাম্॥
নিস্ত্ বার্ লোহি দিলম্ জুজ্ আলিফ্ কোয়ামাৎ-ই-ইয়ার।
চেকুনম্ ইর্ফ-ই-দিগর ইয়াদ্ নাদাদ্ উস্তাদাম্॥

(মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আনন্দের সহিত বলিতেছি—আমি ভালবাসার বন্দী এবং উভয় লোক-স্বর্গ ও মর্ত্ত-হইতে মুক্ত।—আমার প্রিয়তমের মূর্ত্তির আলিফ্ (প্রথমাক্ষর) ছাড়া আমার হৃদয় পটে আর কোন অক্ষর লেখা নাই। ওগো, আমি কি করিব— আমার শিক্ষক যে আমায় আর কোন অক্ষর শেখান নাই !)

কবিতার স্তর পরম্পরায় হাফিজের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এইবার আমি তাঁহার কাব্যালোচনা করিব।

২

সিরাজ্ দেশের কোকিল হাফিজের সঙ্গীতরাজি চিরন্তন আনন্দের উৎস ; তাঁহার কবিতা কেবলমাত্র পারস্য সাহিত্যের বা পারস্যভাযাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা কবিতামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই উপসেব্য। সমস্ত যুগের ও সমস্ত দেশের কবিত্বশক্তি হাফিজের মায়াদণ্ডে যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

এক কথায় তিনি জগতের কবি। তাঁহার গানের মধ্যে যে ভাব ও রস প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, তাহা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করিলেও অক্ষুন্ন ও সুন্দর থাকিবে বটে, কিন্তু অনুবাদ কাব্য সৌন্দর্য্য, ভাষা ও ঝঙ্কারের সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইবে। অনুবাদ কেবল মূলের মোট ভাবটী বহন করিতে পারে, মূলের মূর্চ্ছনা কেমন করিয়া দেখাইব? কেমন করিয়া হাফিজের গজলের প্রেম-কম্পিত বিরহ-ব্যাকুল সুর ফুটাইয়া তুলিব? ইরান্‌দেশের আঙ্গুর বাগান, আপেল ও ন্যাসপাতি-কুঞ্জ, বুলবুলের হৃদয়দাহী গুঞ্জন, সাইপ্রেশ্‌—লতার সুকুমার সৌন্দর্য্য, খর্জ্জুর বৃক্ষের চারিদিকে সেই সন্তপ্ত পবন, ভারবাহী উষ্ট্রের সেই জীবন-ভার নামাইবার ক্লান্ত ভাবটী—কেমন করিয়া অনুবাদে জাগাইয়া তুলিব? 'বাহারে'র বা বসন্তের প্রাণোন্মাদী সৌন্দর্য্য, যৌবন-দৃপ্তা সাকীর হস্তে সিরাজির পূর্ণ পেয়ালা, বিরহিনী নারীর প্রেম-মহিমা কেমন করিয়া অনুবাদের বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশিত হইবে? তবে যে আরবী বয়েদ্‌টী আমি এই প্রবন্ধের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিব, "আমি তোমাকে একটা আভাস—একটা ছবি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার সৌন্দর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিবে কি?" হাফিজ কেবল ভাবসম্পদেই ধনী নহেন, বর্ণনা-লালিত্যেও তিনি অনিন্দনীয়; তাই বলিতেছিলাম, যে অনুবাদে তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়া যাইবে।

কলাবিৎরূপে হাফিজকে উপস্থাপিত: করিয়া তাঁহার গুণাবলী নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কবির সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান—তিনি কেমন জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চিন্তার ধারা, তাঁহার কবিতার প্রধান মূল্য ও সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহাই বক্ষ্যমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার গীতি কবিতার মধ্যে চিন্তা ও ভাবের যে তরঙ্গগুলি বহিয়া গিয়াছে, সেইগুলি নির্দ্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। এইগুলিই কবির চিন্তার গভীর অর্থ ও ধারা নির্দ্ধারণে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করে। আবশ্যক মত আমরা কবির **দীবান্‌** বা গজল-সমষ্টির বঙ্গানুবাদ দিয়া আমাদের কথা বলিতে চেষ্টা করিব। কেবল মাত্র যথেচ্ছ কতকগুলি শ্লোকোদ্ধার করিয়া আমরা প্রবন্ধটী ভারক্লিষ্ট করিয়া তুলিব না; কারণ প্রত্যেক গজল ও দ্বিপদী কবিতা যেন জ্যোৎস্নার কণা—ভাবের মমতাজ—সৌন্দর্য্যের মণি-মন্দির বলিয়া প্রত্যেক কবিতাই উদ্ধার করিতে ইচ্ছা হয়।

জীবনেতিহাসের প্রত্যেক খুটীনাটীর কথা ধরিলে আমরা দেখিতে পাই যে অন্যান্য কয়েকজন জগৎপূজ্য কবির ন্যায় হাফিজের জীবন-কাহিনীও আঁধারে বিলুপ্ত। পূর্ব্বতন **তাজ্‌কারা** বা কবিজীবনের ইতিহাসের মধ্যে আমরা যে ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার জীবন চরিতের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং সে সমস্তও কিংবদন্তী ও প্রবাদ বচনের উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে হাফিজকে বুঝিবার উপায় নাই; সুতরাং আমরা তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব!

হাফিজ যে নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কবিতার মর্ম্মগ্রাহিগণ কিছুতেই অস্বীকার করিবে না। তাঁহার জীবন সুন্দর, সংযত, শান্ত, নির্ম্মল—ধর্ম্মের নামে তিনি যথেচ্ছাচারিতা আনেন নাই প্রেমের নামে কলুষতা বা পঙ্কিলতা আনিয়া কাব্য—সুন্দরীর অঙ্গে 'গাঢ় কলঙ্কের দাগ্‌ আঁকিয়া দেন নাই। **দীবানে** কতকগুলি কবিতা আছে তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, হাফিজ প্রাতে উঠিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন ও কোরাণ পড়িতেন। একটী গজলে তিনি বলিতেছেন, "হে হাফিজ, যতদিন তুমি তোমার কুটীরের নির্জ্জনতায় ও রজনীর অন্ধকারে তোমার মন্ত্র ও কোরাণ পাঠ করিবে, ততদিন তোমার কোনই ভয় নাই।" এমন নির্ভরতা জগতে বড়ই দুর্লভ।

৩

যুক্তি ও বিচারসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করিবেন না যে হাফিজ সিরাজিপূর্ণ পেয়ালার অন্ধভক্ত ছিলেন। সমান ভাবুকতা ও রসের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না বলিয়াই তিনি যে মদিরা ও সাকীর আচরণে রূপক-চ্ছলে অনেক উচ্চভাবদ্যোতক কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমালোচকের নিকট সহজেই ধরা পড়ে। বস্তুতঃ এরূপ বর্ণনা-ভঙ্গী পারস্য কবিগণের মামুলী-প্রথা এবং এবং এই প্রথানুকরণে কেবলমাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে যে কামনার রক্তবহ্নিমুখে কবি পতঙ্গের মত ছুটিয়া যান নাই—পরন্তু তিনি যে শব্দসমষ্টি লইয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে আর একটা মহনীয় ও চরণীয় জগৎ আছে। হাফিজ এবং পারস্যদেশীয় অন্যান্য সূফী বা অস্পষ্টবাদী (Mystic) কবিদের ইহাই বিশেষত্ব। ভাবুক ও রসজ্ঞ পাঠক

মাত্রই দেখিবেন যে তাঁহাদের কবিতা অধ্যাত্ম ও ভক্তিমূলক ; কিন্তু তাহাদের ভাব রাজি এমন পরিচ্ছদে সজ্জিত যে তাহা কেমল ইন্দ্রিয়ভোগেরই পরিচায়ক। হাফিজের ভিতর এমন একজন মানবের পরিচয় পাই, যিনি প্রেমে গরীয়ান্ ও পবিত্রতায় মহান্। ধর্ম্মের যথার্থভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি চরিত্রনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল রকম ভানের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে ব্যবধান তাঁহার অসহ্য ছিল ; ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে পীড়িত করিত ; প্রেমের মধ্যে 'খাদ্' মিশানো তিনি দেখিতে পারিতেন না।

আমরা এই কথা বলিতেছি না যে হাফিজ সন্ন্যাসী ছিলেন, বা তাঁহার "কীণাঙ্ক-কঠিন" জীবনে হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও সহজ প্রবৃত্তিগুলি কখনও জাগে নাই। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি যদি যথার্থ ই সংসারত্যাগী বৈরাগী হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রেমের এই মনোমোহন সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু তিনি কখনও 'জাগতিক' :প্রেমে মজিয়াছিলেন কিনা—তাহা আমাদের অজ্ঞাত ; তবে কয়েকজন সুধী সমালোচক তাঁহার কবিতার মধ্যে কবির "মানসীর" সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। আমরা জানি দান্তের বিয়াষ্টিচে ছিল, পেত্রার্কের ল্যরা দে নাভিস্ (Laura de Novrs) নাম্নী একজন কুহকিনী ছিল, তাসোর (Tasso) লিওনারা (Leonara) ছিল, সেক্স্পীয়রের "W; H" নামে একজন প্রচ্ছন্ন নামা দেবতা ছিল, চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী ছিল, বিদ্যাপতির লছমী দেবী ছিল, জয়দেব "পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" ছিলেন, বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ সনেট্-লেখক কামোয়েনস্ (Comoens) এর কাথারিন্ ডা'টেড্ (Catherine d'Ataid) নামে একজন মোহিনী ছিল, স্কট্ল্যাণ্ডের কবি প্রথম জেম্স্'র লেডি জেন ব্যফোর্ট (Lady Jane Beaufort) ছিল ইত্যাদি। প্রণয়িণীর উচ্ছ্বাসে সূর্য্যোদয়ে রজতগিরি হিমালয়ের উপর বহুরশ্মিরেখার ন্যায় তাঁহাদের কাব্য মহিমা ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এমন কি কাহারও বা প্রণয়িণীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যস্ফূর্ত্তি সমাধি লাভ করিত। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে যে লছমী দেবী সভাপার্শ্বস্থ মর্ম্মর বাতায়ন হইতে তিরোহিত হইলেই কবির কাব্য—প্রতিভা স্তিমিত হইয়া যাইত। হাফিজ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—"আমার কথায় যে মধুরতা ফুটিয়া উঠে, তাহা সহিষ্ণুতার ফল, আমি ইহার দ্বারাই সাকী নাবাৎকে লাভ করিতে পারিয়াছি।" আর একটি কবিতার প্রারম্ভে তিনি বলিতেছেন :—

ফর্‌রুখের বদন-বিভায়
প্রাণ মোর জ্বলে কামনায়—
ফর্‌রুখের স্রস্ত কেশপ্রায়
প্রাণ মোর পড়েছে ধাঁধায় !

কেহ কেহ অনুমান করেন এই ফর্‌রুখই তাঁহার স্বপ্নসুন্দরী মানসী ; আবার অনেকে বলেন সূফী কবির দ্ব্যর্থব্যঞ্জক 'ফর্‌রুখ' শব্দটি মহম্মদকেই উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে !

হাফিজ মানবীয় প্রেমে মজিয়াছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার হৃদয় প্রেমের মোহনবর্ণে গভীরভাবে রঞ্জিত ; এখানে প্রেম অর্থে আমরা পারমার্থিক প্রেমের কথা বলিতেছি—যাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বদেশিক, যাহা অন্তঃকরণের মধ্যে মিলনের নেশা জাগাইয়া দেয়। তাঁহার কবিতা ধারাধৌত যুথীর ন্যায় নির্ম্মল, পবিত্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার কবিতা আমাদিগকে রোমাঞ্চ ও মুগ্ধ করিয়া দেয় বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে, তাহা কখনও হৃদয়হীনের প্রলাপ নহে। আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কবির কল্পনা-বিহঙ্গী কত উচ্চে কোন্ আনন্দলোকে আপনার মানস-নীড় রচনা করিয়াছিল :—

'মহাকালের প্রারম্ভে তোমার সৌন্দর্য্য-কণা ফুটিয়াছিল—তখনই ভালবাসা আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল।'

'......তোমার ভালবাসা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনঃপ্রাণ বিকশিত করিয়াছে—এই ভালবাসা কেবল জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত অবসানলাভ করিবে।

এইখানে আমাদের একটু মন্তব্য আছে। বাঞ্ছিতের জন্য কবির যে আকুলতা ও অতৃপ্তি,—তাহা কি এক জীবনেই শেষ হয় ? কবি ইসলাম ধর্ম্মী, হিন্দুত্বের আদর্শে ও প্রতিবেশ প্রভাবে তাঁহার চরিত্র গঠিত না হইলেও পরপারের পাথেয়-স্বল্পতা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করে নাই। তিনি ইহলোকেই তাঁহার ভালবাসার পর্য্যবসান করিয়াছেন। তাই ভক্তিরসাশ্রিত কবিতা ব্যতীত তাঁহাকে কখন কখন জড় বাসনারও উপাসনা করিতে দেখিতে পাই :—

'ওগো সাকি, এমন মদিরা দাও যাহার প্রভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কারণ স্বর্গে ত রুক্‌নাবাদের নদীকূল নাই, মুশাল্লার বনভূমিও নাই ! ('মুশাল্লা' অর্থে মন্দির-স্থান, বা বন্ধুজনের বসন্তকালীন মিলন-ক্ষেত্র ; রুক্‌নাবাদ—স্থানীয়

নদী)। নদী, কানন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কবি কত আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা এই কবিতায় সুন্দরভাবে পরিকীর্ত্তিত; পার্থিব বস্তু যে অশাশ্বত—তাহার জন্যও একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস পূর্ব্বোক্ত কবিতাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে লীন হইয়া আছে। আমাদের মনে হয়, যেন দুই এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কবি একটী নদীকূলে বসিয়া পাদচুম্বী তরঙ্গলীলা দেখিতেছেন, সেই চিত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে পুষ্পিত বনভূমি, আর উপরে অনন্তশূন্যে অস্তমান্ সূর্য্যের শোণিমরাগ সঙ্গে সঙ্গে টেনিসনের সেই মধুর ভণিতাটী মনে পড়ে।

"For men may come, and men may go,
But I go on for ever"—
কত লোক আসে, কত লোক যায়,—
আমি কিন্তু বহি চিরতরে।

হাফিজ যে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার অভাব অভিযোগ খুব অল্প ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তথাপি কাব্যের নীরব সাধনা করিবার জন্য যে টুকু শান্তি ও সাংসারিক সুখ থাকা প্রয়োজন, তাহা নিশ্চয়ই তিনি ধনী পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কারণ, তৎকালে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ভারতীয় পুরোহিতগণকে সাহায্যদানে উৎসাহিত করিতেন। সে কালে পারস্যে কাশিদা (eulogia) বা প্রশস্তি-কবিতা লিখিবার রীতি ছিল। হাফিজও পারস্যরাজ মনসুরকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—"তোমার অধীনে কার্য্য করিয়া আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, এবং (তোমার নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া) আমি অমরত্বলাভ করিয়াছি।" অন্য কয়েকটী গজলে হাজি কাওয়াম্, দ্বিতীয় আশ্—আফ্, খাওয়াজা খিবামুদ্দীন প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তিনি কেবল মাত্র তাঁহার নিজদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য পান নাই। সুদুর ভারতবর্ষে তাঁহার যশোরশ্মি বিকীরিত হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমান রাজার দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তথায় আগমন করেন নাই। উত্তর স্বরূপ তিনি একটী গজল লিখিয়া পাঠাইলেন; তাহা এই;—'জীবনের ভীতিপূর্ণ রাজ-মুকুট লোভজনক শিরোভূষণ বটে, কিন্তু শিরঃপীড়া ঘটায় বলিয়া আমি ইহা চাহিনা।'

তাঁহার কবিতার সমসাময়িক সমালোচনার প্রতি ও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আমরা কখনো বা তাঁহাকে আত্মপ্রশংসাবাদে আনন্দিত হইতে দেখি।

আত্ম গুণ কীর্ত্তন পারস্য কবিগণের চিরন্তন প্রথা। কিন্তু হাফিজ গতানুগতিকের ন্যায় সে প্রথার অনুসরণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা মুক্তার মালার মত।—পাঠকগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিলে গগন মণ্ডল তাঁহার কবিতার উপর তারকা-কুসুম বর্ষণ করিবে। কার্য্যগৌরব ইহা অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল ভবভূতির সেই গৈরিক-নির্ঝর-পূর্ণ শ্লোকটী মনে পড়ে—"উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা" ইত্যাদি। সঙ্কীর্ণচিত্ত সমালোচকদের প্রতিও তিনি একটু তীব্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হাফিজের কবিতার যে দোষানুসন্ধান করে, বলিব-তাহার মোটেই রসবৈচিত্র্য অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই।'

[ক্রমশঃ]

প্রেমের পাল্লা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ভারি চোট্‌পাট্—খুব কড়াকড়া বুলি
—না হয় আজ্‌কে দিয়েছ দু'গাছা রুলী?
চুল ওঠে তাই দিয়েছ যে তেল কিনে
তা'তেত তোমারো গরজ কম দেখিনে!
কপালের টিপ?—দু'খানা আলতা পাতা?
ছাতা দিয়ে তাই কিনে ফেলেছেন মাথা!
হলুদ রঙের সূতো এক ফেটি কই?
এদিকে বলেন,—"তুমি ছাড়া কারো নই!"
নাকছাবী টাত ডবডবে বেমানান
ভালবাস কত তাই বুঝি এ জানান?
দুল দিতে ভুল একমাস যার হয়
সে কেন দেখায় 'বেবাগী' হ'বার ভয়?
মিছে কথা গুনো কেমনে যে মুখে ফোটে
এখনও যে পুবে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে
আমার জন্য খেটে খেটে তুমি সারা?

আগে ভেবে দেখ কথাটা কেমন ধারা !
নাক ডেকে ঘুম ? কখন শুন্‌লে বল ?
দিনে ঘুম ?—আমি ? মার কাছে বসে বসে
রামায়ণ পড়ি খরচ দিই যে কসে'—
তোপ ভোরে উঠি, তখনি রাঁধার তাড়া
বাবুর—ঘুমত ভাঙ্গে না চায়ের পেয়ালা ছাড়া !
ঘর ঝাট দেওয়া একগাদা পান সাজা
ওঠা নামা করে পড়ে গেল মোর মাজা,
এর মাঝে কর টেবিল বাজিয়ে গান
সত্যি বল্‌ছি,—আন্‌চান্ করে প্রাণ !

সাবানের কথা ? বলোনাক' মুখ নেড়ে
আতরের শিশি ? কালত নিয়েছ কেড়ে !
সাবান মাখিলে তাতে দেবে রোজ গালি
বাক্স এদিকে তোমার হাতেই খালি ।
গন্ধ মাখিনে সন্ধ করেছ মনে
কত কথা তুমি বলেছ দিদির সনে ।
"হেনা"র শিশিটা উপহার দিলে সই
"লক্ষ্মীটি মেখো" বলে দিলে পই পই
বেছে বেছে কেনা অমন সাধের "জুঁই"
তোমারে লুকায়ে বল দেখি কোথা থুই ?
ভাল যে বেসেছ সেটাকি এমন বেশী

কথা না কহিলে কেঁদেছ সত্যি বটে
কার দোষ ? বলি—বুদ্ধি নেই কি ঘটে ?
উপরে 'কলে' জল ওঠেনিক কাল
সংসার করা জাননাত নাজেহাল !
ঘুম পেয়েছিল কইতে পারনি কথা
অমনি বাজিল পরাণে দারুণ ব্যথা ?

রেগে শুলে ভুঁয়ে বিছানাটা ছেড়ে দিয়ে
অতএব-ফোঁস—কেন করেছিলে বিয়ে ?
কাছ ছাড়া হলে সয়না সেটাত জানি ?
তা বলে কেমনে পাল্লায় বড় মানি ?

'চিঠি চিঠি' বলে গর্ব্ব করো না আর
সে গুমোর ওগো হয়ে গেছে সব বা'র
তিন খানি চিঠি দিই ছিলে রেখে ঢেকে
দাসী-দিয়েছিল—পাঁ—চ খানা একে একে !
যা দিয়েছ তার দিগুণ নিয়েছ ফিরে
মিথ্যা বলোনা রইল মাথার কিরে ।

পতিতার সিদ্ধি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ]

(২৬)

স্ত্রীর দৃঢ়তার-কাছে হার মানিয়া চারুর 'বাবু' ব্রজেন্দ্রনাথ যে সময়ে অবসাদে শয্যায় শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি এগারোটা। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সেই নূতন প্রবিষ্ট চারুর বাড়ীতে তাহাকে একা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত মনুষ্য-হীনতার কার্য্য হয় মনে করিয়া সন্ধ্যার পর হইতেই ব্রজেন্দ্র সেখানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী নির্ম্মলা কিছুতেই তাহাকে আজ বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। সে জন্য নির্ম্মলাকে আজ একটু বিশেষ উগ্র মূর্ত্তিই ধরিতে হইয়াছিল। নয় বছরের বালক নালু যদিও ক্রুদ্ধা মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে বিপন্ন পিতাকে, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুঁটি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই !

ব্রজেন্দ্র যাইবার জন্য মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়াছিল বলিয়াছিল না গেলে চারু একা থাকিবে খুব সম্ভব বিপদে পড়িবে।

নির্ম্মলা বলিয়াছিল সেটা স্বামীর গাড়োলত্ব, সে বেশ্যাকে একা থাকিতে হইবে না, গাড়োলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা খায়, তাদের মধ্যে একজন সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে সারারাত্রি আগুলিয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রায়—এগারোটার সময় চাকর হেমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া এবং তাহাকে সারারাত্রি সেখানে থাকিবার আদেশ দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বাস্তবিক অবসন্নেরই মত শয়ন করিল!

ঝোঁকের সময়টা উত্তীর্ণ হইতেই সে বুঝিয়াছিল, নির্ম্মলা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে না দিয়া যথার্থ স্ত্রীর যোগ্যই কাজ করিয়াছে। সে বিষম ঝড়ে অন্ধকারে বাহির হইলে বিপদের যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল।

নির্ম্মলা সবই ভাল করিয়াছে, কেবল একটি কথা কহিয়া সে চারুর প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরের ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। সে বলিয়াছে, চারু ব্রজেন্দ্রের বিরহে সারারাত্রি তার বিছানায় পড়িয়া কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঝড় খাইয়া ছটফট করিবে না, আর একটি খেঁকশিয়ালী জাতীয় ধূর্ত্ত এই ঝড়ের সুযোগ গাড়োল ব্রজেন্দ্রের স্থান অধিকার করিবে। বরং আফিস হইতে ঘরে না আসিয়া প্রারম্ভেই যদি সে চারুর কাছে যাইত, তাহা হইলে যতক্ষণ নির্ম্মলা স্বামীর সংবাদ না পাইত, ততক্ষণ সে উঠিয়া বসিয়া চলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইত না।

শয্যায় পড়িয়া যে সময় ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কঠোর বাক্যের প্রতিবাদ স্বরূপ চারুর নির্ম্মলত্ব-ধ্যানে একটু তন্ময় হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া বুঝি তাহাকে একবার ডাকিয়াছিল ব্রজেন্দ্র সেটা শুনিতে পায় নাই।

স্বামী ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া সে একবার শয্যার পার্শ্বে আসিল। কাছে গিয়াই তার বুঝি একটু জোরের নিশ্বাস সে শুনিতে পাইল। শুনিয়াই বলিল —"দীর্ঘ নিঃশ্বাস—কেন গো? এখনও ত যাবার সময় উত্তীর্ণ হয় নি।"

"না নির্ম্মলা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। এখন বুঝেছি, তুমি আমাকে ধরে রেখে ভালই করেছো। তবে তাকে এতটা হীন মনে করা তোমার অন্যায় হয়েছে।"

"বেশ ত গো মহৎ সে। তার মাহাত্ম্য না জেনে একটা কথা কয়েছি, তাতে অতবড় দীর্ঘশ্বাস কেন? হেমাকে ত আগ্‌লাবার ভার দিয়েছ—"

"তাতে বেশী অন্যায় হয়ে গেছে নির্ম্মলা। বরঞ্চ তাকে না পাঠানোই ছিল ভাল। আমি যে যেতে পারলুম না তাতে তত দোষ হয় নি। সে

নিশ্চয়ই বুঝতো আমি চেষ্টা করেও বাড়ী থেকে বেরুতে পারি নি; কিন্তু হেমাকে পাঠাতে সে মনে করতে পারে যে আমি তাকে বিশ্বাস করি না।"

"তবে তাকে পাঠালে কেন? হেমাকে পাঠাতে আমি ত বলিনি।"

এ কথায় ব্রজেন্দ্রের উত্তর দিবার কিছুই ছিল না। নির্ম্মলা ত তাহাকে যাইতে বলে নাই। শুধু তাই কেন, তার চিঠিখানা ত সে নির্ম্মলাকে একেবারেই গোপন করিয়া পাঠাইয়াছে। তবু সে বলিল—"তুমি যে রকম করতে লাগলে!"

"আমি কি করলুম? ও বুঝেছি—তা আমার কথা শুনেই সে সতীরাণীর মহত্ত্বে তোমার সন্দেহ হয়ে গেল?"

"সন্দেহ হবে কেন!"

"দেখ, লেখাপড়া শিখেও যে মানুষের এত অধঃপতন হ'তে পারে তা জানতুম না। আমার মনে যা এলো, মুখেও তাই বলেছি, কিন্তু তুমি এমনি পুরুষ, মনের কথা মুখে আনতে ত সাহস করলে না, কাজে দেখালে। আবার এখন তার জন্য আমাকে দোষী করছ। আমার কথায় হেমাকে পাঠাওনি ঠাকুর, সতীরাণীকে এতটুকু বিশ্বাস কর না বলেই পাঠিয়েছ!"

"আমাকে বিশ্রাম করতে দাও।"

"বেশ, আমার কথাতেই যদি হেমাকে পাঠিয়ে থাক, তা হ'লে বল, আমি একখানা ক্ষমাপত্র লিখে সে মাগীর কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"কি আপদ, তুমি যে বাহিরের ঝড় ঘরে ঢোকালে দেখছি।"

"তবে আর কি, দুর্গা বলে বাইরের ঝড়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়।" বলিয়া নির্ম্মলা চারুকে উপলক্ষ করিয়া আরও গোটাকতক তীব্র রহস্য স্বামীকে শুনাইয়া দিল। সেই সঙ্গে সে চারু যে ব্রজেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অনাথিনী থাকিবে না, একথা দ্বিতীয়বার শুনাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

কলহশেষে তার কথার সত্যতার নির্দ্ধারণে হেমার ফিরিবার প্রতীক্ষায় যখন নির্ম্মলা তার রোরুদ্যমানা কন্যাকে শান্ত করিতে নিজের শয্যায় চলিয়া গেল, তখন ব্রজেন্দ্র কতকগুলা ভাবনার আক্রমণের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া নিরুপায়ে—ঘুমাইয়া পড়িল।

(২৬)

স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য আজ যেমন সে প্রয়োগ করিয়াছে, এরূপটি নির্ম্মলা এর পূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। করিবার যত প্রকার কারণ

থাকিবার থাকিলেও সে করে নাই। স্বামীর প্রতি কঠোর হইবার জন্য দুচার জন সমবেদনাময়ী মহিলা এমন কি তার সৎশ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও সে বরাবর মিষ্ট ব্যবহারেই স্বামীর কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর এই বেশ্যাসক্তির জন্য অন্তর তার সর্ব্বদা অসুখী থাকিত বলিয়া মুখে যে সে স্বামীর কাছে ভিখারিণীর মত করুণার আবেদন শুনাইবে, সে মেয়ে নির্ম্মলা আপনাকে কোনও কালে মনে করিতে পারে নাই।

তাহার উপর স্বামীর এই বিষম দোষেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, দোষটা যেন তার দেখিয়াও দেখিত না।

এরূপ করিবার তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার স্বামী এমন একটা বড় রকমের কুলীন যে, তার একটিমাত্র বিবাহ তখনকার অনেকটা পরিবর্ত্তিত যুগেও তাহার সমাজে অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেন না ব্রজেন্দ্র অন্যদার পরিগ্রহ করিতে নিরস্ত হওয়ায় তাহার পাল্‌টি ঘরের মধ্যে দুই চারিটী কন্যার আজীবন কুমারী থাকিবার অবস্থা হইয়াছিল।

তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল বিক্রমপুর। ব্রজেন্দ্রের পিতা নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি বিবাহসূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শ্বশুর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, শিক্ষিত শেষে তার সাহায্যে হাকিম হইয়াও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একাধিক বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁর শ্বশুর এরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিষেধ করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র আর বিবাহ করে নাই। নির্ম্মলার একাধিকার সুখ ভাঙ্গিয়া দিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর সমাজের দিক হইতে এক একটা বেশ প্রবল রকমের আক্রমণ আসিত। তাহার শ্বশুর পর্য্যন্ত দুই একটা আক্রমণে এমন নির্দ্দয় ভাবে যোগ দিয়াছিলেন যে স্বামীর একমাত্র দৃঢ়তা ভিন্ন কিছুতেই সে সপত্নী-দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইত না।

সুতরাং আগেকার নির্ম্মল-চরিত্র কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে পদস্খলিত স্বামীর এ দোষটাকে নির্ম্মলা ততটা দোষের মধ্যে গণ্য করিত না। তার স্বামী ও কৃতবিদ্য। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের এটর্ণিগিরি করিয়া এত সে অর্থ উপার্জ্জন করে যে, তাহা হইতে বহু অর্থ অপব্যায় করিয়াও যে টাকা সে নির্ম্মলার হাতে আনিয়া দেয়, তাই যদি সে রাখিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র নালুবাবু মূর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও পায়ের উপর পা দিয়া আজীবন বসিয়া খাইতে পারিবে। স্বামী যদি আর দুই একটা বিবাহ করিত এবং তাহাদের প্রত্যেকের পেটে দুই

একটি করিয়া ছেলে মেয়ে হইত, তা হইলে নালুবাবুর যা ক্ষতি হইত, নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে স্বামী চারুর মত দু চারিটা রক্ষিতা রাখিলে তার এক আনাও ক্ষতি হইবে না।

স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া নির্ম্মলার চিত্তটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তবে তার দুঃখের মধ্যেও একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তার উপেক্ষার নীরবতা স্বামীকে অনুতপ্ত করিতে এতটা যে শাসন করিয়াছে, তাহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। আজ আত্মহারা ব্রজেন্দ্রকে ঝড়ে ঘর হইতে কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না বলিয়া কোমর বাঁধিতে সেটা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, স্বামী তার চরিত্রহীনতার জন্য অনুতপ্ত। তার আর চারুর গৃহে যাইবার ইচ্ছা নাই।

তবে বিনাপরাধে কেমন করিয়া স্বামী চারুকে পরিত্যাগ করিবে। চারুর রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র নিজেইত উপযাচক হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে। তাহাকে আয়ত্ত করিতে চারুর কত অবজ্ঞাত প্রেমিকের হা হুতাশ ও অভিশাপের কণ্টকময় বেড়া যে ব্রজেন্দ্রকে ভেদ করিতে হইয়াছে। সে কথা মনে করিলে, চারুর কাছে নির্ম্মলাকেইত মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে স্বামীকে অনুরোধ করাত পরের কথা। বিনাপরাধে এখন চারুকে পরিত্যাগ করিলেই বা তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব থাকে কই? স্বামীর সহিত কলহ করিতে গিয়া নির্ম্মলা বুঝিল, সে চারুকে পরিত্যাগ করিতে এখন কেবল তার বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করিতেছে। হেমাকে পাঠাইয়াছে ব্রজেন্দ্র চারুকে আগলাইবার জন্য নহে, আর কেহ লুকাইয়া তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে কি না সেটা ও জানিবার জন্য। স্বামী ঘুমাইয়াছে, কিন্তু নির্ম্মলার ঘুম হইতেছে না। শয্যায় পড়িয়া হেমার মুখ হইতে একটা সুসংবাদের প্রত্যাশায় সে কেবল দেবতাকে মানত করিতেছে। হেমা ফিরিয়া যেই স্বামীকে বলিবে চারুর ঘরে মানুষ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, অমনি সে হেমাকে ভাল রকম বক্‌সিস্ দিবেই, দেবতার জন্য ও ষোড়শোপচারের পূজার খরচ তখনি মাথায় ঠেকাইয়া সে বাহিরের ঝড়ের অবসানে ভিতরকার চিরাবরুদ্ধ ঝড়টাকেও গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দেবতার চোখের ও অন্তরাল করিবে।

(১৭)

দুপুর বাজিবার পর সে শুইয়াছে। একটা, দুইটা ঘড়ী তাহার ঘণ্টা দিয়া নির্ম্মলার অনিদ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়া গেল। দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে

এক সময় জাগিয়া থাকিবার বিশেষ চেষ্টাতেও সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। ঘড়ীতে তিনটা বাজিতে তার শেষ শব্দটা পূর্ব্বের শব্দ দুটার মত যেমনি নির্ম্মলার কাণের পাশ দিয়া নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিল অমনি সে এক চমকেই বিছানার ওপর বসিয়া দেখিল, ঘরের আলোটা নিভিয়া গিয়াছে।

তার চারিদিকে দৃঢ় আবদ্ধ ঘরের জানালাসার্শির ফাঁকদিয়া ঢুকিয়া বাহিরের ক্ষীণ আর্ত্তনাদকারী ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সেফ্‌টিল্যাম্পের আলোক শিখাটাকে যে খাইয়া ফেলিতে পারে এটা নির্ম্মলার মনে হইল না। সে বিছানা হইতে উঠিল, সংশয়ত্রস্ত পদে স্বামীর পালঙ্কের কাছে উপস্থিত হইল, প্রথমে পাশে দাঁড়াইয়া নিদ্রিতের স্বভাবগভীর শ্বাসশব্দ শুনিতে একটুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল, কোনও শব্দ শুনিতে না পাওয়া ঝড়ের দুষ্টামির জন্যও হইতে পারে মনে করিয়া হাত দিয়া বিছানাটা পরীক্ষা করিতে বুঝিল সেখানে স্বামী নাই।

তখন দুই হাত দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে জানিতে পারিল, বাহির হইতে দ্বারবন্ধ করিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। তার যাওয়াটা বেশীক্ষণ না হইলেও নির্ম্মল এটা বেশ বুঝিল, চারুর বাড়ীতে যাইবার সমস্ত বিঘ্ন সে যেন সিন্দুকে পূরিয়া তালা বন্ধ করিয়াছে। ঘরের দুই দিকেই দোর, দুই দিকই প্রশস্ত বারান্দা ছিল। নির্ম্মলার স্বামীর নির্ম্মমতার সুনিশ্চিত একটা পরিমাণ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। এইবারে আবার নিজের শয্যার কাছে আসিল। বিছানার তলা হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া জ্বালিয়া দেখিল, কই স্বামী ত লণ্ঠনটা লইয়া যায় নাই। তখন সেটা জ্বালিয়া সে অন্যদিকের দোর খুলিল। খুলিতেই ঝড়ের তখনও পর্য্যন্ত প্রবলের অনুভূতির সঙ্গে স্বামীর মোহজবিচেষ্টা কল্পনার সমস্ত তীব্রতা দিয়া সত্যের মতন করিয়া সে গাঁথিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বামী তাকে শেষকালে কেবল কতকগুলা স্তোকবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছে।

এখন সে কি করিবে? অবজ্ঞাতার নৈরাশ্যের ভিতর নিশ্চিহ্ন নিমজ্জিত, পূর্ব্ব হইতেই তার অবসন্ন চিত্ত লইয়া কিই বা এখন সে করিতে পারে? স্বামী অনেকক্ষণ ঘর ত্যাগ না করিলেও, বাড়ী ছাড়িয়া পথে পড়িবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। আলোটা নিবিয়া যাইবার কারণ ও সে কল্পনার সাহায্যে নির্ণয় করিল। আলো থাকিলে পাছে তার চমকা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া স্বামীর যাইবার মুখে আবার সে তাকে ধরিয়া বসে, তাই তার তন্দ্রার উপরে ঘুমের প্রগাঢ়তা

ঢালিবার জন্য, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলেও তাহার অনুসরণ পথটা দীর্ঘ করিবার জন্য স্বামী আলো নিবাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আবার দোর আঁটিয়া শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া আবার উঠিয়া বসিল। অভিমান ঈর্ষ্যার মধ্য দিয়া পত্নীর যে পতি অনুরক্তি অতি গোপনে মনকে লুকাইয়া হৃদয় পথ দিয়া চলাচল করে, তার একটা অঙ্গুলি পীড়ন নির্ম্মলার শয়ন চেষ্টাকে কাতর করিয়া দিল।

"বৌদি!"

তার সৎশ্বাশুড়ীর ঘর দিয়া স্বামীর তত্ত্ব লইবার সঙ্কল্পে যেমন সে আবার দোর খুলিবার জন্য খিলটিতে হাত দিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা বাহির হইতে দোরের আঘাতের সঙ্গে শুভার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। শুভা তার সৎশ্বাশুড়ীর একমাত্র কন্যা।

নির্ম্মলা দোর খুলিল।

"তুমি কি দোর ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে বৌদি?"

"ডাকছিস্ কেন?"

"শিগ্‌গির এসো।"

"কোথায়?"

"দাদাকে ধরতে।"

যেটা সে আপনি আপনি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সে কাজে নির্ম্মলার প্রবৃত্তি আবার আপনি দমিত হইয়া গেল।

"কেন?"

"কেন, পরে বলব বৌদি, আগে তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনো।

"দরকার কি? আর তোর এ কি রকম আক্কেল শুভা, আইবুড়ো ধেড়ে মেয়ে ভাইকে আগলাতে এতরাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রয়েছিস্!"

"তোমার জন্য বৌদি!"

"আমার জন্য তোর অত মমতার বাড়াবাড়ি করতে হবে না, তোর দাদা কোথায়?"

"এখনও বাড়ী আছেন—কোচোয়ানকে গাড়ী জুততে বলেছেন।"

"তুই কি সদর দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলি নাকি!" শুভার উত্তর পাওয়ার মুহূর্ত্তের বিলম্ব ও অসহনীয় বোধে নির্ম্মলা আবার বলিল, "ছি শুভা, কেউ যদি বাইরের লোক কোথা থেকে অন্ধকারে তোকে একা ঘুরতে দেখতো—"

"মা আমার সঙ্গে আছে।"

"বৌমা!" বলিয়াই শুভার মা নির্ম্মলার কাছে আসিয়া, শুভারই মত, তার স্বামীকে ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিল।

"ধরে লাভ কি মা?"

"লাভালাভ বোঝবার সময় নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্র রিভালবার নিয়ে যাচ্ছে।" এই এক কথাতেই সমস্ত বুঝিয়া নির্ম্মলা আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিতে ছুটিয়া গেল।

শুভা ও সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, মায়ের নিষেধে যাইতে পারিল না। এই সময় পুঁটিটা কাঁদিয়া উঠিতে তাহার যাইবারও উপায় রহিল না।

(২৮)

চাকর বিশু জাতিতে কাহার, বহুদিন হইতে চারুর গৃহে চাকরী করিতেছে। তাহাতে মাহিনা ছাড়া আরও পাঁচরকম উপরি রোজগারে কয়েক বৎসর হইতে এমন লুব্ধ হহয়াছে যে, এখন যদি কেহ জুতা মারিয়াও তাহাকে চারুর ঘর হইতে বাহির করিতে যায়, তাহা হইলেও সে তার মনিবনীর চৌকাট ধরিরা উপুড় হইয়া সেগুলা নিঃশব্দে পৃষ্ঠস্থ করিবে, তবু চৌকাট হইতে হাত ছাড়িবে না। সে চারুর বাবুকে কেবল চারুর জন্যই বুঝে, সুতরাং এই নিমকভোজীর আখ্যাধারী নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির চাকর যখন তার মনিবনীর কাছে শুনিল যে বাবু আসিলেও তাহাকে না জানাইয়া যেন সে দোর খুলিয়া না দেয়, তখন বাবুর চাকর হেমা যে আসিবা মাত্রই বিশুর কাছে দরজা খোলা পাইবে, এটা আমাদের বুঝিতে যাওয়া মস্ত ভুল।

হেমা যখন ঘরের উৎপাতে অস্থির হইয়া বারংবার দোরে ঘা দিয়া শীঘ্র তাহা খুলিয়া দিতে বিশুকে হুকুমের উপর হুকুম করিল, বিশু তখন তাহাকে বাহিরেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া তার 'মায়ী'কে খবর দিতে উপরে চলিয়া গেল। সুতরাং বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমা যে শুধু 'বিশে'র উপর মর্ম্মান্তিক চটিল এমন নয়, বাবুর বিবির ঘরে যে দোসরা মানুষ প্রবেশ করিয়াছে এ বিষয়েও তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকায় তাহারও উপরে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল সারারাত জলে ভিজিয়া, শীতে জমিয়া যদি সেইখানে আজ তাহাকে মরিতে হয় তবু সেই উপচোরটাকে না ধরিয়া কিছুতেই সে দোর ছাড়িয়া যাইবে না।

ঝড় যেমন তাকে মাঝে মাঝে এক একটা সরস রহস্যের ধাক্কা দিতে লাগিল, তার সঙ্কল্পটাও সেই অনুপাতে দমে ভারী হইতে লাগিল।

কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইয়া চারুকে মনিবের পত্র দেখাইতে যখন সে তৎকর্ত্তৃক নীত হইয়া সে রাত্রির সেই নবাগত রক্ষকটিকে দেখিল, তখন সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। এযে তার মনিবেরই বাড়ীতে পূজারির কার্য্য করে। ঈর্ষায় ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু চারু সুষুপ্ত রাখুকে এত সন্তর্পণে একটিবারের মত দেখাইয়া, আবার তাহাকে এমন যত্নে অন্ধকারে ঢাকিয়া হেমার চোখের অন্তরাল করিয়া দিল যে, একান্ত নীরব হওয়া ভিন্ন একটা দীর্ঘশ্বাসেও তখন তার ক্রোধ প্রকাশের উপায় রহিল না।

দেখাইয়া চারু সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া হেমাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল, সেখানে তার দত্ত চিঠিখানা পড়িয়া প্রত্যুত্তরে একখানা চিঠি লিখিয়া হাতে দিয়া বাবুকে দিবার জন্য তাহাকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল। হেমা সেখানে রাত্রিকালে থাকিবার কথায় বাবুর আদেশ জানাইলে বলিল থাকিবার তার কোনও প্রয়োজন নাই, যে হেতু তাকে রক্ষা করিতে ভগবান্ রক্ষক পাঠাইয়াছেন।

রাখুর সেখানে উপস্থিতির কৈফিয়ৎ চারু পরিস্কাররূপে দিলেও চাকরটা তাকে বিশ্বাস করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার এ অর্থশূন্য ভগবানের দয়ার কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করিল না। এটাতে বিশেষতঃ চারুর মমতাশূন্য ব্যবহারে তার দুরভিসন্ধিটাই সে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইল।

রাখুর নিদ্রা ও কপট বলিয়া তার বোধ হইল। সেই দুর্য্যোগে বাড়ীতে ফিরা নিতান্ত সহজ না হইলেও, সে মনিবকে এই নিমকহারামীর কথা শুনাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে, আকাশ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সেই মুহূর্ত্তেই চারুর ঘর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সেই ট্যানাপরা ঠাকুর—পূজা-করা ভিৎভিতে বামুনটার অদ্ভুত সাহস তার ভিতরে ঈর্ষ্যার আগুনটা এমন জাগাইয়া তুলিল যে, বায়ুর সজল ফুৎকারও তাহা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল তার হাত পা মুখ চোখ—এমন কি সকল অঙ্গে কতকগুলা ক্রোধের সঞ্চালন যোগ করিল মাত্র।

তবে—নীচে আসিয়া দেখিল বিষেটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এ সুযোগটা ছাড়া কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। বিশের ঘুমটার সঙ্গে তার দুই

একবার পরিচয় হইয়াছিল। বিশু নিজে নিমকহারাম না হইলেও, তার ঘুমটা মাঝে মাঝে নিমকহারামি করিত। যে রাত্রিতে তার কিছু উপরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, সে দিন ঘুমটা তার বহিঃসংজ্ঞাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিত যে ঢাকের বাদ্য তার কাণের কাছে তাণ্ডবনৃত্য করিলেও সে বিশুর কাণকে তার অস্তিত্ব জানিতে দিত না।

হেমচন্দ্র এ সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না। সে মনে করিল, মনিবকে যদি এই নিমকহারামির কথা শুনাইতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়াই তাহাকে শুনাইয়া দিইনা কেন! সে তখন সদরে যাইবার পথের পার্শ্বে, যেখানে পূর্ব্বে চারু রাখুকে বসাইয়াছিল, সেই ধাপের উপর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রাখু সিঁড়ির মাথায় চলিষ্ণু অন্ধকাররূপে এই হেমাকেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেমচন্দ্র লুকাইয়া লুকাইয়া চারু ও রাখুর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। দেখিয়া উত্তরোত্তর বুকের ভিতর এত ঈর্ষার উত্তাপ সে সঞ্চয় করিয়াছে যে, যখন রাখুকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া চারু সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করিল, তখন সে দৃশ্য একান্ত অসহ্য জ্বালায় উন্মত্তের মত করিয়া চারুর বাড়ী হইতে সেই বিষম দুর্য্যোগের ঘনতমসাচ্ছন্ন রাজ পথে তাহাকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিল।

যাহা দেখিয়াছে তাহার সঙ্গে যাহা না দেখিয়াছে কল্পনায় যোগ দিয়া হেমা তাহার মনিবকে চারু ও রাখুর রাত্রিবিলাসকাহিনী এমন করিয়া শুনাইল যে, ব্রজেন্দ্রের শিক্ষাসংযতচিত্ত ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। চারু রাখু উভয়কেই একসঙ্গে হত্যা করিবার জন্য ঈর্ষা-মত্ত ব্রজেন্দ্র যখন নিজের পরিণাম ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া রিভলবার খুঁজিয়া দিতে হেমাকে জেদের উপর জেদ, শেষে তীব্র ভাষায় গালি দিতেছিল, আর চতুর হেমা সেটাকে আগেই লুকাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অছিলায় বৈঠকখানা ঘরের সব আসবাব পত্র ওলটপালট করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই শুভা দাদার অনুসরণে সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা গুলা শুনিতে পাইল। শুনিয়াই ভীতি বিহ্বলা সে মাকে গিয়া সে কথা শুনাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

প্রেম-মুগ্ধা

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

১

দ্বারকার রাজভোগে তৃপ্তিহীন নারায়ণ,
পড়ে মনে ক্ষণে ক্ষণে মধুমাখা বৃন্দাবন!
কোথা সখা সখীদল, নিথর তমালতল,
যমুনার ‘কল’ গীতি,
বাঁশীর আকুল তান,
সকলি স্বপন হেন হ’ল যেন:অবসান।

২

মহিষীগণেরে তাই কন হরি অনুক্ষণ
“গোপী-প্রেম-মাধুরীতে পূর্ণ মোর প্রাণ-মন!”
সবিস্ময়ে ভাবে সবে, ‘এত সুখৈশ্বর্য্য ভবে,
রাখালরাজার তবু
কেন চিত্ত উচাটন,
কিযে আছে গোপীপ্রেমে যার এত আকর্ষণ!”

৩

কে জানিবে সে সন্ধান—শ্যামের ব্যাকুল প্রাণ—
কোথা ক্ষুদ্র কমলিনী কোথা রবি জ্যোতিষ্মাণ!
দিনে দিনে ক্ষীণ কায়, সারা হৃদি কারে চায়,
উৎকন্ঠিতা সত্যভামা,
রুক্মিনী উন্মত্তা প্রায়।
সন্ধ্যার আঁধার নামে দ্বারকা ও মথুরায়!

৪

শ্রীকৃষ্ণেরে নিরখিতে একদা নারদ ঋষি
আসিলেন দ্বারকায় মাতাইয়া দশদিশি!

হেরি তাঁর ম্লান মুখ শুধাইলা কিবা দুখ,
কহিলেন লীলাময়—
"গুরু ব্যাধি—প্রতিকার—
একটুকু পদধূলি !—কেবা দিবে উপহার ?"

৫

গোপী-কথা বিনে তাঁর অন্য কথা নাহি আর,
শুনি দেবর্ষির মনে লাগে বড় চমৎকার !
রোগ গ্রস্ত নারায়ণ, সম্ভব কি কদাচন ?
"পদধূলি প্রতিকার"
এযে আরো সমস্যার !
তারপর "গোপী-প্রেম"—সেত নহে বুঝিবার !

৬

কি জানে প্রেমের কথা অবোধ আভীরবালা,
যার লাগি নিশিদিন এমন অধীর কালা
রাণীদের এত সেবা, কখন পেয়েছে কেবা,
তবু তৃপ্তি—শান্তি হীন,
তবু নিত্য এত জ্বালা !
মণিহারে কে করিল অতর্কিতে ফণি-মালা !

৭

সংশয়-দোদুল-চিত্তে দেবর্ষি চলিলা ফিরি'
নীরব মুখর বীণা, উড়ে জটা ধীরি ধীরি।
শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা লয়ে, উত্তরিলা দেবালয়ে,
ভেটিলেন একে একে
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে,
মাগিলেন "পদধূলি" শ্যামের আরোগ্য তরে !

৮

সসম্ভ্রমে কন তাঁরা "ক্ষিপ্ত তুমি হে নারদ !
ত্রিলোক অর্চ্চনা করে যাঁর পদ-কোকনদ,

তারে দিব পদ ধূলি ! দেবর্ষি ! গিয়েছ ভুলি'
আপনি পুরুষোত্তম
শ্রীকৃষ্ণের অবতার,
ব্যাধি তাঁর ? কি আশ্চর্য্য ! একি লীলা আরবার !"

৯

দেবর্ষি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরি করিলেন অন্বেষণ
কেবা দিবে পদধূলি শ্যাম-ব্যাধি-বিমোচন !
এন্ত সবে দ্বিধা ভরে, কেমনে সাহস করে,
ক্ষুদ্র নদী করিবারে
সিন্ধু-তৃষ্ণা নিবারণ !
পাবকে শুদ্ধতা দান শুনেছে কি কোন জন ?

১০

দেবর্ষি নিরাশ হয়ে ফিরিলেন দ্বারকায়,
শ্রীকৃষ্ণে কহিলা বিশ্বে পদধূলি মিলা দায় !
লীলাময় মৃদু হাসি সুধাইলা "ব্রজবাসী
একটুকু পদধূলি
দিল না আমারে হায় !
এমন নিষ্ঠুর তারা ছিল না যে ধারণায় !"

১১

উত্তরিলা মহামুনি "আমিত যাইনি তথা,
গোপ-গোপী-পদধূলি ভিক্ষা করা বাতুলতা !"
কহিলেন ভগবান, "অভিমানে যায় প্রাণ !
একবার হে দেবর্ষি !
দয়া করে সেথা যাও !
একটুকু পদরজঃ মোর তরে যদি পাও !"

১২

দেবর্ষি ত্যজিয়া কুণ্ঠা পশিলেন বৃন্দাবনে,
হেরিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে শত বর্ষ অদর্শনে

প্রেমভূমি মৃত প্রায়, প্রেতভূমি যেন হায়,
বিরহ-কাতর হৃদি
ব্রজবাসী উদাসীন,
কৃষ্ণ নাম জপি' শুধু যাপে দগ্ধ নিশিদিন !

১৩

নীরব তমাল কুঞ্জ, বাঁশরী বাজে না আর,
বহে না উজান আজি কালো বারি যমুনার '
ধবলী শ্যামলী নাই, কোথায় সুবল ভাই,
কায়াহীন ছায়া সম
আজি শ্যাম-বিনোদিনী,
মরমের ক্ষত-চিহ্নে খুঁজে শান্তি অভাগিনী !

১৪

অকস্মাৎ দেবর্ষির বীণা বাজে কৃষ্ণ নামে,
ক্ষণে যেন নব প্রাণ সঞ্চারিত ব্রজধামে !
ছুটে এসে প্রতিজন কহে "কোথা প্রাণ ধন"
দেবর্ষি জানায়ে পীড়া·
চাহিলেন পদধূলি,
বজ্রাহত সবে যেন মর্ম্ম-গ্রন্থি গেল খুলি' !

১৫

প্রাণ-বঁধু রোগাকুল—পদধূলি প্রয়োজন—
কেমনে রহিবে স্থির কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীগণ !
কহে সবে ব্যগ্র ভরে, "হে দেবর্ষি ! কৃপা করে
লও লও পদধূলি
যতটুকু চাই তাঁর !
বল বল আমরা কি যাব সাথে একবার !"

১৬

দেবর্ষি বিস্ময়ে কন "তোমরা পাগল হলে ?
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দিলে রসাতলে ?

শ্রীকৃষ্ণ গোলকপতি, বিশ্বের পরম গতি
তাঁরে দিতে পদধূলি
চাহ সবে অকাতরে !"
অনন্ত নরক-ভীতি ভুলিলে কেমন করে !'

১৭

করযোড়ে সবে কয় "হে প্রভু ! হে দয়াময় !
জানি না নরক স্বর্গ পাপপুণ্য কারে কয় !
মোদের সর্ব্বস্ব সার, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাধার,
মোরাও যে সব তাঁর,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব তিনি ।
কোথায় গোলক আর কেবা পতি নাহি চিনি !"

১৮

"লও লও পদধূলি"—কহে সবে আরবার—
"ভেট ত্বরা প্রিয়তমে ঘুচাও যাতনা তাঁর !"
গোপীগণ কথা শুনি, স্তম্ভিত নারদ মুনি,
কি গভীর কৃষ্ণ-প্রীতি,
কিবা আত্ম-সমর্পণ !
বুঝিলেন "গোপীপ্রেম" মুগ্ধ কিসে নারায়ণ !

রাজনীতি ও ধর্ম্ম ।

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

ধর্ম্ম যখন কোন একটা বিশেষ জিনিষ বা প্রণালীর উপর নির্ভর করে তখনি সেটা সমস্ত লোকের ধর্ম্ম না হয়ে শ্রেণী বিশেষের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি আমি বলি, হেটমুণ্ড হয়ে গিরিগুহায় গিয়ে ভগবানের চিন্তায় রত থাকাই একমাত্র ধর্ম্ম, তা হলে দু চার জন মানলেও মানতে পারে কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ তা কখনই মানতে রাজী হবে না। ভারতবর্ষ জোর করেই বলবে—"স্বভাবো অধ্যাত্ম।" যে প্রেরণার বশবর্ত্তী

হয়ে বুদ্ধ রাজ্যধন পরিত্যাগ করে—"ইহাসনে শোষ্যতু মে শরীরম"—(এই আসনেই আমার শরীর শুকিয়ে যাক্) এই পণ করে দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় রত হয়েছিলেন, যে প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়ে রাণা প্রতাপ সমস্ত পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় গিরিগুহায় দিনাতিপাত করেছিলেন, সেই স্বভাব, সেই সহজ প্রবৃত্তি, যার জোরে মানুষ সাধারণের চোখে যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করে তোলে তাই মানুষের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ কেমন করে ভুলবে ভগবানের বাণী—"সহজং কুরু কর্ম্ম কৌন্তেয় !" যে কর্ম্মের মধ্যে মানুষ সমস্ত মন প্রাণ অতি সহজে ঢেলে দিয়ে আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে উঠে, তা যত কঠিনই হক তার পক্ষে তা আহার বিহারের মত সহজ ও সরল। ৭২ দিন অনাহারে থেকে জীবন পাত করা আইরীস বীর ম্যাকস্থইনির পক্ষে চব্য চোষ্য লেহ্য-পেয় খেয়ে জীবন ধারণ করার মত সহজ হয়েছিল।

তাই যেমন ভারতবর্ষ—একদিকে নির্জ্জনে ধ্যান নিরত যতিদিগকেও শ্রেষ্ঠাসন দিয়েছে অপর দিকে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" এই আদর্শকেও তেমনি স্থানই দিয়েছে।

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"

ইহাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুত্বের মধ্যে একত্ব এই আদর্শই বরাবর ভারতবর্ষে স্থান পেয়েছে। সৃজন পালন ও সংহার এই ত্রিমূর্ত্তিতেই ভারতের ভগবান ভারতের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। মা অন্নপূর্ণাও ভারতের মা, করালবদনী কালীও ভারতের মা, ইহাই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষকে বিচার করতে হলে এসব ভুললে চলবে না।

কিন্তু মানুষের এমনি স্বভাব যে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির গণ্ডী দিয়ে একটা অচলায়তনের বেড়া দাঁড় করিয়ে তোলে। আর দেশের যখন অবনতি হয়, যখন স্বাধীন চিন্তার অভাব হয় তখন সব দিকে তা দেখতে পাওয়া যায়। তাই অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে মঠে শুনতে পাই আমরা সাধু সন্ন্যাসী, রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই রাজনীতিকে যেন একটু তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়, তাঁরা যেন মনে করেন রাজনীতি শঠতারই অপভ্রংশ মাত্র। তবে একথা সত্য পাশ্চাত্যের রাজনীতি দেখে বিচার করতে গেলে অনেকটা সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয়। কিন্তু স্বামী রামতীর্থের

কথায় বদ্ধজলে যেমন শেওলা গজায় তেমন ভারতবর্ষে ৫৬ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী গজিয়ে উঠেছে, অবশ্য মাঝে মাঝে সুন্দর মনোনয়নাস্নিগ্ধকর পদ্মফুলও ফুটে রয়েছে, তাই বলে কি সাধু সন্ন্যাসীরা সাধু হওয়ার বিরুদ্ধ মত প্রচার করে। যদি কোন এক যায়গার অধিকাংশ লোক ভগবানের পূজা করে ডাকাতি করতে বার হয় তবে কি বলতে হবে ভগবানের পূজা করাই অন্যায়? আজ রাজনীতি শঠের হাতে পড়ে শঠতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে বলে কি রাজনীতিকে পরিত্যাগ করাই ধর্ম্ম হবে? আজ যদি আমার চোখ কুৎসিৎ দৃশ্য দেখে তবে কি তাকে উৎপাটিত করে দেওয়াই ঠিক হবে, না তাকে সংযত করে ক্রমশঃ সবার মাঝারে যে ভগবানের বিরাট রূপ তা দেখতে পারে তাই করতে হবে। অবশ্য অস্বীকার করবার জো নাই যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ রাজনীতিবিদ্ পাশ্চাত্য রাজনীতিকেই রাজনীতি বলে মনে করেন—তাই বলে কি ভগবানের পরিপূর্ণ সত্ত্বাকে খণ্ডরূপে দেখতে হবে, তাই বলে কি রাজনীতিকে তার প্রাপ্য আসন থেকে সরিয়ে দিতে হবে!

বহুদিনের সংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দিরে যদি শুধু এই ভাবটা নিবদ্ধ থাকতো তা হলে বিশেষ কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু এ ভাব যেন ভারতের জাতীয় জীবনের ধমনীতে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছে। এই সঙ্কীর্ণতার হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বর্ত্তমান আন্দোলনকে একটু ভাল করে বুঝতে হবে। ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর ভীরুতার উপরই বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। তাই এই আন্দোলন কি "সর্ব্ব প্রদানেষু অভয় প্রদানম্" তার সাকার রূপ নহে! আজ সমস্ত ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে অসমর্থ; যদি এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে পারে তাহা কি ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে না! এই শাসনের ফলে বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে যায় তার ফলে ভারতবর্ষ আজ অনাহার ও অনশন প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ তার নিত্য-সহচর। ভারতের সব থাকতেও সে আজ ভিখারীবেশে দণ্ডায়মান। আমাদের দেশে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হয় না, অর্থের দুর্ভিক্ষ হয়। মনে পড়ে ১৯১৫ সালে যখন ত্রিপুরা জেলায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-প্রপীড়িত স্থানে কর্ম্ম করিতে যাই তখন চাউলের মণ ৫৲ টাকা ছিল এবং লোকজন তাহাই কিনিতে অসমর্থ। সুজলা সুফলা বাংলাদেশে আজ ত্রিপুরা, কাল বাঁকুড়া, পরশু খুলনা এইতো আমরা দেখে আসছি। এই অনশনক্লিষ্ট

লোকদের মুখে একমুঠা অন্ন দেওয়া তো সকলেই ধর্ম্ম মনে করে, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা সকলেই ভাল মনে করে, তবে কেন যাতে দরিদ্র নারায়ণ দেশে না জন্মায় তার চেষ্টা করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে না! চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে রোগ হলে তার প্রতীকারের চেষ্টার চেয়ে রোগ যাতে না হতে পারে সে বিধান করাই প্রকৃষ্ট।

ইহাই তো রাজনৈতিক আন্দোলন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধানের জন্মই রাজনীতি, তা যদি ধর্ম্ম না হয় তবে তো ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শুধু একদল নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে মানুষ ভুল পথ ধরতে পারে, তা ত জগতের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই রাজনীতিকে ধর্ম্মহতে পৃথক করে দেঁখা আমাদের সঙ্কীর্ণতা। যে দিন ভারত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিল সে দিন সে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়ায় নাই। প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র হিন্দুর কাছে ভগবানের অবতার, তিনিই তো রাবণের নিকট হতে রাজনীতি শিক্ষা করেছিলেন। তাতে তাঁর ভগবানত্বের হানি হয় নাই। আমরা অক্ষম দুর্ব্বল তাই এই রাজনীতি বিভীষিকা, আবার অপর দিকেও যে ধর্ম্ম বিভীষিকা আছে এই উভয়ই দূর করতে হবে। ধরতে হবে, মানতে হবে সেই ভগবানের পরিপূর্ণ সত্বাকে যেখানে ধর্ম্ম রাজনীতিকে বাদ দিয়ে নয়, যেখানে রাজনীতি ধর্ম্ম, শঠতা নয়। তবেই আবার ভারতের ধর্ম্ম জীবন্ত হয়ে উঠবে, জাগ্রত হয়ে উঠবে, তবেই তার রাজনীতি পাশ্চাত্য রাজনীতির কলঙ্ক কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে শারদ চন্দ্রমার ন্যায় স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে জগৎকে আনন্দ দেবে। আমরা জানি এই সামঞ্জস্যই ভারতের মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

কালের মহিমা অনন্ত। কাল অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া দেয়, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনে। কালের মহিমায় অপ্রিয়ের স্মৃতিও প্রিয় হইয়া ওঠে।

মোটের উপর অতীতের স্মৃতি বড় মিঠে, যেন বীণার তারের সুপ্ত ঝঙ্কারের মত আঘাত করিলেই মধুর ভাবে ঝঙ্কারিয়া ওঠে।

অনেক সময় অতীতের স্মৃতি বড় পীড়াদায়ক। কিন্তু সে পীড়া বোধের মধ্যেও যেন সুখ থাকে। তখন যে চিত্তের মর্ম্ম স্থানটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া যায়। সে সময় যে নিজের সহিত বড় নির্জ্জনে বড় গোপনে আলাপ হইতে থাকে।

সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা যেন জীবনভোর আমাদের সহিত রঙ্গ করে, কিন্তু একান্তভাবে কোনটাই বহুদিন স্থায়ী হয় না সবি যায় কেবল স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে।

স্মৃতিপটে অনেক ছোট জিনিষ বড় হয় ও বড় জিনিষ ছোট হইয়া যায়, আবার অনেক জিনিষ মনের কোণে এমনি ডুব মারে যে খুঁজিয়া পাওয়া দায় হয়।

বারানসী ষড়যন্ত্র মামলায় আমার সাজা হয়। ১৯১৫ সালের ২৬শে জুন ধরা পড়ি ও ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ই তারিখে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডপাই ও সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কিছু দিন কাশীর জেলে থাকিয়া আগষ্ট মাসে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হই। ১৮ আগষ্ট আন্দামানের জেলে আসিয়া প্রবেশ করি। পুনরায় ইচ্ছাময়ের অভিপ্রেতানুসারে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাটের ঘোষণা পত্রানুসারে মুক্তি লাভ করি।

এই কয়েক বৎসর লইয়াই আমার বন্দীজীবন। এই বন্দীজীবন অবলম্বন করিয়া যে সংস্পর্শে বন্দী হইয়াছিলাম তাহারও কতকটা পরিচয় দিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ যাহাতে ঠিক মত লিখিত হইতে পারে এই সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়াই আজ লিখিতে বসিয়াছি।

ভারতের অদৃষ্ট এক সুমহান সন্ধিক্ষণের ভিতর দিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে সে ভীষণ বিপ্লব কাহিনী। নিয়তির গোপন ডাকে আপনার সুনির্দ্দিষ্ট পথে অথচ যেন মনে হয় নিজের খেয়াল মত ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে আমিও সেই নিয়তির বশেই ঐরূপ একটি ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার মত আরও কত যুবক স্বীয় মর্ম্মকোণের অব্যক্ত বেদনায় চঞ্চল হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিধাতার অভীষ্ট সাধনের জন্যই দলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই দলের অভ্যন্তরীণ পরিচয় যাহা কর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার বাসনা

হৃদয়ে বহুদিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আজ তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস করিতেছি।

ঘটনাকেই অনেক সময় আমরা বড় করিয়া দেখি, কিন্তু ঘটনার অন্তরালে যে মহাশক্তির খেলা থাকে, তা সে যত ক্ষুদ্র ঘটনাই হউকনা কেন, তাহা যে ঘটনার চাইতেও বহু মূল্যবান্ ইহা আমরা ভাল করিয়া বুঝি না। সফলতার মোহ প্রতি পদে আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। সে মোহ বিচার দ্বারা ছিন্ন হইলেও প্রাণ সে মোহাবেশ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বড় বড় ঘটনার চাইতেও জীবন-যাপনের ছোট খাট খুটিনাটিটিও ছোট নহে। ঘটনাটার সূত্রপাত চিন্তাজগতেই হইয়া থাকে।

এই উপলক্ষে ব্যক্তির চরিত্র আলোচিত হইলেও উহা ব্যক্তিগত ভাবে করা হইবে না। ব্যক্তির পরিচয় ব্যতিরেকে সমষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই জন্য ব্যক্তির চরিত্রের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

এই পরিচয় দিতে গিয়া নিজের ও নিজের দলের বহু ছিদ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাই বলিয়া কি যে সকল দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা অন্তরে অন্তরে আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে গোপন রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিব? ব্যর্থ ত হইবেই, কারণ একদিন না একদিন সত্য ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর গোপন করিতে গেলে কেবল যে সত্যের অপলাপ করা হইবে তাহা নহে তাহাতে আমাদের পঙ্গুত্ব আরও বাড়িয়া যাইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" কথাটির সার্থকতা বুঝিতে পারি নাই।

পূর্ব্ব-পরিচয়।

(১)

কলিকাতা রাজাবাজারে একটি ছোট্ট দুইতলা খোলার ছাতের বাড়ী ছিল। দেখিলে মনে হয় যেন গরীবদিগের আবাস স্থান। ইহা ট্রাম conductor বা ঐরূপ জাতীয় লোকদিগের মেস ছিল। ইহারই উপর তলায় একটি ঘরে শ্রীশশাঙ্কমোহন হাজরা নামে একটী যুবক থাকিতেন। তিনি যখন ধরা পড়েন তখন বোমার খোলের সহিত যোগ ও সাধন বিষয় কয়একটি প্রবন্ধও তাঁহার ঘর হইতে পাওয়া যায়। বিচার কালে কোনও বাবু ঐ প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলেন যে ওগুলি কেবল ছলনা মাত্র, লোকদিগকে বিপথগামী করিবার

একটি উপায়। আমরা কিন্তু জানি তাহা মোটেই নহে। আমরা সত্য সত্যই ঐ সাধন জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভগবানই যে সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা ইহা আমরা কেবল মুখেই বলিতাম না, সত্য সত্যই গভীর শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিতাম। স্বীয় কর্ম্মোদ্ধারের জন্যই কেবল ভগবানকে টানিয়া আনিতাম না, ভগবানের অধিনায়কত্বের বিষয় লইয়া আলোচনায় ও ভাবনায় কতদিন এমন কি কত রাত্রিও অতিবাহিত হইয়াছে।

এই যে মহা আন্দোলন ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে আমরা বিশ্বাস করি, ইহাও সেই তাঁহারই ইঙ্গিতে সাধিত হইতেছে। যে ভাবের অব্যর্থ প্রেরণায়-ভারতের শত শত যুবক মরণ বরণ করিয়া বিষম বিপদের মুখেও কৌতুকে অগ্রসর হইয়াছেন, সে প্রেরণার বলে তাঁহারা অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ধীর সংযমীর ন্যায় সহ্য করিয়াছেন, এই ভাবের বন্যা কি কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা দেশে আনীত হইয়াছে? না ইহার স্থায়িত্ব কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মত অথবা মরণ বাঁচনের উপর নির্ভর করে?

যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখন হইতেই স্বদেশ উদ্ধারের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। ইহা ত আমি কাহারও নিকট হইতে পাই নাই। ইহা আমার প্রাণে প্রাণে অত অল্প বয়সে কে বলিয়া দিল? বাল্যকাল হইতেই যে এই বিষয় লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তখনও ত স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত হয় নাই। আর কেবল যে আমার মনেই এইরূপ ছিল তাহা নহে। পরিণত বয়সে অনেকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মত দেশে আরও অনেকেই আছেন। যেন মনে হয় আপনার অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য ভগবান পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়া আসিতেছেন।

(২)

১৯১৫ সাল ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ সালে বিপ্লবের যে বিরাট আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়, এত বড় আয়োজন, ৫৭ সালের মহা বিপ্লবের পর এক পাঞ্জাবের কুকা বিদ্রোহ ছাড়া আর হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই চক্রান্ত ধরা পড়িবার পরই "ভারত রক্ষা" আইনের পত্তন হয়। তদানীন্তন হোম মেম্বর ক্র্যাডক সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত আইনের প্রস্তাব উত্থাপন কালে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন—

"We had had anarchism for a long time in Bengal, but the situation in the Punjab was serious, in Bengal it was less so" যথার্থই ভারতের অবস্থা সে সময় নিতান্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে বাঙ্গলার বিষয়ে ক্র্যাডক সাহেবের অভিজ্ঞতা সে সময় অল্পই ছিল। কিছুদিন পরে ক্র্যাডক সাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের বিপ্লব-পন্থীদিগের সহিত বাঙ্গলার যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রথমে তাঁহাদিগের যে ধারণা ছিল পরে সে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়।

উত্তর ভারতের বহু ষড়যন্ত্র মামলাতেই অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের ধারণা ঐ সকল কথার অধিকাংশই মিথ্যা। অনেকে আমায় বলিয়াছিলেন যে পুলিশ সব মিথ্যা সাজাইয়া কেবল মকর্দ্দমা খাড়া করিয়াছে। সত্য সত্যই দেশে ওরূপ কিছু হয় নাই। ইঁহাদের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে অন্তর-জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকিতাম। মনে করিতাম দেশবাসীর আত্মশক্তিবোধ এতই লোপ পাইয়াছে যে তাঁহাদের স্বজাতীয়েরা ঐরূপ কিছু করিতে পারেন ইহা তাঁহাদের ধারণাতেই আসে না। কিন্তু অন্তরের অসহিষ্ণুতায় মনের কথা ত খুলিয়া বলিতে পারিতাম না, সেই জন্য জ্বালা আরও বেশী বোধ হইত। কোমাগাটা মারুর শিখ যাত্রিদিগকে কানাডায় অবতরণ করিতে না দেওয়ায় তাঁহাদিগের মনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহারই অগ্নিকণা যখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল ভারতের একপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া তাহাই আমরা আশায় বেদনায় চঞ্চল হইয়া অসহিষ্ণুর মতই নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। পাঞ্জাবে যাঁহারা আমাদিগের লোক ছিলেন তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করিলেই যেন তাহাদিগকে দলে টানিয়া লওয়া হয়।

কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করিতে করিতেই এক মহা কাণ্ড হইয়া গেল। আমাদের আশা আরও বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কানাডা ও ক্যালিফর্ণিয়া হইতে দলে দলে আরও কত শিখ আসিতে লাগিল। এই সকল দল ভারতে আসিবার পথে স্থানে স্থানে নামিয়া শিখ পুলিস ও শিখ রেজিমেণ্টে যাইয়া বিপ্লবাগ্নি ছড়াইতে ছিলেন। ইহার বহুদিন যাবৎ ভারতের বাহিরে থাকায় গোপনে কিরূপে ষড়যন্ত্র করিতে হয় তা মোটেই জানিতেন না। তাই প্রকাশ্য ভাবে জাহাজে জাহাজে, বন্দরে বন্দরে, ইঁহারা বিপ্লব-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ইহারই ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট

সতর্ক হইয়া যান। যেমন যেমন শিখদল স্বদেশে আসিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন তেমন তেমন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতেও তাঁহাদের রীতিমত অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। এইরূপ একটি দলের প্রায় তিন শত ব্যক্তিকে সোজা মুলতান জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইঁহাদের অনেককেই সরকার বাহাদুর নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করেন। ইহাদের অনেকের নিকট বহু অর্থও ছিল। ইহারা আমেরিকায় কএকবৎসর ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সবই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এসব টাকা সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাদের একজনের নিকট প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ছিল।

অনেকে আবার স্বীয় উপার্জ্জিত সকল অর্থই California যুগান্তর আশ্রমে দিয়া আসিয়াছিলেন। যে সকল দল সরকারের নজর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাঁহারা আসিয়া পাঞ্জাবে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। শিখদিগের ধর্ম্ম মন্দিরগুলির নাম গুরুদ্বারা। এই সকল জায়গায় শিখদিগের পুরোহিতগণ বাস করেন। ইঁহাদিগকে শিখগণ গ্রান্থীজি বলেন। এক একটি গুরুদ্বারা এক একজন গ্রান্থী আছেন। এই সব গুরুদ্বারা গুলিই বিপ্লবপন্থী শিখদিগের সম্মিলন কেন্দ্র হয়। এইরূপ একটি গুরুদ্বারায় বসিয়াছিলাম। একটি শিখ আসিয়া খবর দিলেন আজ অমুক অমুককে অমুক গুরুদ্বারায় ঢুকিতে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। অল্পক্ষণ পরেই দেখি সেই দলের মুখ্য ব্যক্তিগণ আমাদের গুরুদ্বারায় আসিয়া উপস্থিত। অর্থের কথা উঠিতেই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা গোল গোল বড় বড় সোণার চাকতিগুলি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। আমেরিকার স্বর্ণমুদ্রাগুলি গুণিয়া দেখা গেল প্রায় সহস্র মুদ্রা। প্রত্যেক দলই এইরূপ করিয়াছিলেন। বিপ্লব কার্য্যে অকাতরে স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ দান করিতে ইঁহাদিগকে যেমন দেখিয়াছি বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেখি নাই। অবশ্য আমেরিকা ফেরত শিখদিগের মধ্যেই এরূপ উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই। তা ছাড়া পাঞ্জাবের অন্য অধিবাসিরা প্রায় কেহই ইঁহাদের সহিত সহানুভূতি দেখান নাই। কেবল পাঠান ও শিখ সৈনিকের সহিত ইঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তবে শিখ জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনাপ্রসূত একতা ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা ঢের বেশি।

যাঁহারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই তথায়

কুলি মজুরের কাজ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয় তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় চাষের কাজ করিয়া বেশ ধনী হন।

ইঁহাদের বহু আত্মীয় স্বজনেরা ভারতের সৈনিক দলভুক্ত ছিলেন। ভারতে আসিয়াই ইঁহারা সৈনিকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময় বাঙ্গালার সহিত পাঞ্জাবের সংযোগ সাধিত হয়। অনেক গুণ থাকিলেও ইঁহাদের organising power বাঙ্গালাদেশের মত ছিল না। বাঙ্গালার সহিত সংযোগের পর হইতে বেশ সুসম্বদ্ধরূপেই কার্য্য আরম্ভ হয়। উত্তর ভারতের প্রায় সকল সৈনিকাবাসেই আমাদের লোকের যাতায়াত আরম্ভ হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বান্নু হইতে আরম্ভ করিয়া দানাপুর পর্য্যন্ত কোনও সৈনিকাবাস বাদ দেওয়া হয় নাই। প্রায় সকল রেজিমেণ্টই কথা দেন যে প্রথমে তাঁহারা কিছুই আরম্ভ করিবেন না তবে বিপ্লব আরম্ভ হইলে বিপ্লবকারিদিগের সহিতই যোগ দিবেন ইহা নিশ্চয়। কেবল লাহোর ও ফিরোজপুরের রেজিমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমেই কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরকার বাহাদুর কিন্তু প্রথম এতটা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে ষড়যন্ত্রকারীরা এত গভীর ভাবে বিপ্লবের আযোজন করিতেছে। তা না হইলে এত দূর অগ্রসরই হইতে পারা যাইত না। বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগের একজন deputy superintendent তাঁহার একটি গুপ্ত চরকে এই দলে ঢুকাইয়া দেন এই ত্রিপাল সিংহই শেষে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

ক্রমশঃ

তাই এত ভালবাসি

[শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা]

(১)

শশী জিনি' তব আঁখি মনোরম
ঢল ঢল রূপরাশি
হাসিটী তোমার জ্যোছনা মধুর
নিখিল আঁধার নাশি',
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(২)

(তুমি) অমল সরসে কুমুদ কমল
বিকচ আনন শশী,
অলক্ত রঞ্জিত নধর অধর
তরুণ অরুণ হাসি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৩)

উছলে যমুনা দিগ দিগন্তর
মধুর সুতানে বাঁশী,
গগনে পবনে অসীমে সসীমে
চপলা ঝলকে হাসি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৪)

জলদবিহীন সুনীল অম্বর
শরত প্রভাত হাসি,
শ্যামল শোভন নধর বরণ
ঝুমকা কুসুম রাশি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৫)

পূরব গগনে উষার মাধুরী
অধরে অরুণ হাসি,
সু-পীত বরণ বসন শোভন
ফুটন্ত অতসী রাশি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

চন্দ্রাবাই

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।]

(১)

সেদিন বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘগুলি সন্ধ্যার আকাশে একটা গভীর বিষাদের ছায়া আঁকিয়া দিতেছিল; বিরহবিধুরা সন্ধ্যারাণীর বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে একটা অবসাদের যবনিকা পড়িয়াছিল, দূরে কোন্ গ্রাম্য পথ হইতে বিরহের করুণ-রাগিণী ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। এমনতর চিত্তচাঞ্চল্যের সময়ে বিরহ মথিত হৃদয়ে—"এ ভরা বাদরে, এ মাহ ভাদরে শূন্য মন্দিরে মোর" বসিয়া থাকিতে বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল; তাই মনটা একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক বসন্তকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাদের আশৈশব বাল্যবন্ধু সুশীলচন্দ্রকে দেখিয়া খুব আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলাম। অনেকদিন হইতে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সম্প্রতি তাঁহার বাসস্থানের কোনও সন্ধান না জানায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আজ না চাহিতে জল পাইয়া চাতকের মত বিশেষ পুলকিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া বড় ব্যথিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সুশীলকেত আমরা বাল্যকাল হইতেই ভালরকম চিনিতাম, তাঁহার ন্যায় হাস্যরসিক বন্ধু জীবনে আর কখনও পাই নাই। তাঁর সদাপ্রফুল্ল হাসিভরা মুখ দেখিয়া কত দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা পাইয়াছি, কত বুক ভাঙ্গা ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি। কই এমনত তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাই তাঁহার এই অচিন্তিত ভাব—পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদের বিস্ময়ের কারণটাও কম ছিল না। যাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও অন্যমনস্ক দেখি নাই, কলেজের প্রফেসার আসিতে বিলম্ব হইলে সমস্ত ক্লাসটি যাহার গল্পগুজবে সরগরম হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা দেখিলে স্বতঃই একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে কোন উত্তর পাইলাম না, কিন্তু আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অথবা তাঁহার আবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"কে বলে স্ত্রী পুরুষে নিষ্কাম বন্ধুত্ব সম্ভবে না? জীবনে মাঝে মাঝে মানুষ প্রেমের এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছে, যেখানে স্বার্থের কলুষ নিশ্বাস

বহিয়া প্রণয়ের পেলব কুসুমটিকে ম্লান করিয়া দিতে পারে না, যেখানে কামনার দুষ্টগন্ধ উঠিয়া প্রণয়ের স্বভাবসুন্দর আবহাওয়া নষ্ট করিয়া দেয় না। এমন এক প্রীতির গ্রামে যখন মানুষ উঠিতে পারে, তখন সে সেই অচ্ছেদ্যপ্রীতি-বন্ধনের ভিতর দিয়াই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা এবং তাহার মাঝে ইন্দুর হাসি উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার নিষ্কাম সখ্যভাব সম্ভবপর। আমার জীবনে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। অহঙ্কার করিতেছি না, আপনাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় বলিতেছি না, কিন্তু সত্যি সত্যি মঙ্গলময় ঈশ্বরের এক অখণ্ডবিধানে আমার হৃদয়ে সে নবভাবের ধারা বহিয়াছিল। এখনও আমার সেই অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি লইয়া বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

"সেবার এম্ এ পরীক্ষা দিয়া কয়েকটা মাস পশ্চিমে বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। তারপর আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই। হয়ত তোমাদের মনে আছে আমি প্রয়াগে যাইবার জন্য বড় উৎসুক ছিলাম। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয় থাকিতেন, তাঁর কাছে কিছুদিন থাকিয়া এলাহাবাদ সহরটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিব ভাবিলাম, তারপর যা হক কপালে থাকিলে আগ্রা দিল্লীটাও বেড়ান হইতে পারে। কিন্তু আসলে আমরা যেমনটি ভাবি তা সেই লীলাময় ঠাকুরটির ইচ্ছায় ঠিক তেমনটি হয়ে উঠে না। আমরা মনে করি আমরা যা স্থির করিব তা যেন কবিতার মিলের মত, ছন্দের গতির মত একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ করিবে; কিন্তু তাহা না হইয়া মাঝে মাঝে কোথা হইতে একটা যতিভঙ্গ একটা বেসুরা ধ্বনি আসিয়া পড়ে। আমার ভাগ্যেও ঠিক এমনিতর হইয়াছিল। তখন কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড ঝড়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার রেলওয়ে লাইনটা স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছিল। কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতায় উহা কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারে নাই। ঠিক মধ্যরাত্রে দুইটি ট্রেণ দুধার দিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, চারিদিকে ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে এইটুকু বুঝিলাম যে দুইটি ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছে। আমি একলা মানুষ, সঙ্গে জিনিষপত্র তেমন কিছুই ছিল না, চেষ্টা চরিত্র করিয়া নামিয়া পড়িলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, কিন্তু তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ; জ্যোৎস্নাপ্লাবনে উচ্চাবনত বনভূমি হাস্য-ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম জনমানবের চিহ্নপর্য্যন্তও নাই কেবল অদূরে বনপক্ষীর কলধ্বনিমাত্র শোনা যাইতেছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একস্থানে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঈষৎ চলিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল। অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম যেন সেই কৌমুদীপ্লাবিতা কাননকুন্তলা বনভূমির উপর বনদেবী অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা যেন সেই উজ্জ্বল নিশীথে নক্ষত্রলোকবিচারিণী কোন জ্যোৎস্নাবালা ধরার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে আসিয়াছেন। পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম বালিকা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসিনী, বয়স সতর আঠারোর কাছাকাছি। মুখে চোখে তার লাবণ্যের এমন একটা দীপ্তি যে তাহাকে স্বতঃ পুণ্যহৃদয়া ও সরলান্তঃকরণা বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম বালিকার পিতা এলাহাবাদের এক প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী, পিতার সহিত কলিকাতা হইতে ফিরিবার মুখে এই দৈব দুর্ঘটনায় এখানে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায় আদৌ সঙ্কোচের ভাব ছিলনা। উন্মুক্তবাতাসে অধিকক্ষণ থাকিলে অসুস্থতাবোধ হইতে পারে এইজন্য আপনা হইতে আমাকে তাহার সহিত সম্মুখস্থ ভগ্নকুটীরে আসিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। হঠাৎ সেই স্তিমিতালোকের আবছায়ায় দেখিতে পাইলাম বালিকার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বালিকাটি দেখিতে পাইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমি দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া একটা পাথর কুড়াইয়া নিয়া সবলে উহার দিকে নিক্ষেপ করিলাম। ঈশ্বরের করুণা বশেই হউক অথবা বালিকার পরমায়ুর জোরেই হউক উহা সাপের মাথায় আঘাত করিল, সাপটিও হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া পলাইয়া গেল। বালিকাটি তাহার আধ আধ হিন্দিবাক্যে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে চারিদিকে উষার অরুণ ছটা দেখা দিল, সেই নবোদিত উষার আলোকে বালিকার রূপজ্যোতি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এইরূপ অনুপম লাবণ্য এমন অনিন্দ্য স্বাস্থ্য বাঙ্গালা দেশে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। চোখ দুটি যেন কোন্ পুণ্যালোকে বিভাসিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, টানা টানা ভ্রূযুগের উপর ললাটদেশ শরতের আকাশখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, দক্ষিণ ভ্রূর উপরে একটি ছোট তিল শরতের আকাশে একটি মেঘের টুকরার মত বৈচিত্র্যে সেই শোভা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, বামগণ্ডের এক পাশে একটি আচিল ক্ষুদ্র তারার মত চিক চিক করিতেছে।

প্রভাত হইয়া আসিল! আমরা তাহার পিতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। একা এই পূর্ণবয়স্কা বালিকার সঙ্গে যাইতে আমার বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ

হইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে চোখে সঙ্কোচের কোনও চিহ্নই দেখিলাম না। কিছু দূর যাইয়া আমরা সেখানকার রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনটা শোন নদীর তীরে নাম ডিরি অন্ সোন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি বালিকার পিতার নাম শ্রীওঙ্কার লাল চতুর্ব্বেদী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীব। তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে ষ্টেসনে কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। বালিকার নিকট রাত্রিসংক্রান্ত সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাকে বহুবিধ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন সোনের তীরটি তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তিনি কয়েক দিন ঐ স্থানে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; কোনও কাজের ঠেকা না থাকিলে আমাকেও দুই চার দিন সেখানে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কন্যাও পিতার সহিত সেই অনুরোধে যোগ দিল এবং আমি যখন তাঁহাদের অনুরোধে সম্মতি জানাইলাম, তখন তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। আমিও কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। তারপর সোন নদীর তীরে কত মধুর সন্ধ্যা তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছি, সেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মৌন সাধনার মাঝে কত আমোদ গল্পে কত সাহিত্য চর্চ্চায় কত পুলকময় সন্ধ্যার আলোকে দুইটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

(২)

"আজ ও মনে পড়ে সেই বিচ্ছেদ কাতর আঁখি দুটি যাহা আমার এলাহাবাদে বিদায়কালে গৃহদ্বারে পথ চাহিয়া সন্ধ্যাতারার মত ফুটিয়াছিল। যদিও অল্পদিনের জন্য আমাদের এ বিচ্ছেদ কারণ তাঁহাদের ও শীঘ্রই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবার কথা তথাপি চন্দ্রার কাতর মুখখানি আমার মনে এমনি আঁকিয়া গিয়াছিল যে প্রকৃতই পথে আমার কান্না আসিতেছিল। বলিতে ভুলিয়াছি মেয়েটির নাম চন্দ্রাবাই।

কিন্তু ভগবান যার কপালে দুঃখ লিখিয়াছেন তার সুখের আশা মিটিবে কেন? এলাহাবাদে আসিয়া শুনিলাম আমার আত্মীয়টী সেখান হইতে কোথায় বদলি হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক যখন আসিয়া পড়িয়াছি তখন না দেখিয়া আর ফিরিব না স্থির করিলাম। একেবারে কৃষ্ণা হোটেলে গিয়া উঠিলাম।

কৃষ্ণা হোটেলটি মোটের উপর মন্দ নয়, আহার শয়নের ব্যবস্থা ভালই। এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ তুল্য নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত সেনেট গৃহের অতি নিকটেই ইহা অবস্থিত। এলাহাবাদে পৌঁছিবার পরের দিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি দেখিয়া আসিলাম। বেড়াইয়া আসিয়া শরীরটা বড় খারাপ লাগিতে লাগিল, মাথায় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। না খাইয়া শুইয়া পড়িলাম, মধ্যরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বুঝিলাম খুব জ্বর হইয়াছে, তারপর জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া রহিলাম। এইরূপ কদিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম জানিনা। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম আমার শয্যার সম্মুখস্থ টেবিলের বইগুলি বেশ গুছান রহিয়াছে, এই লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চন্দ্রা একহাতে পথ্য ও আরেক হাতে এক গ্লাস জল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। চন্দ্রাকে এখানে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার অচেতন অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া চন্দ্রা বড় আহ্লাদিত হইল, তাহার মুখের প্রফুল্লভাব দেখিয়া আমি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তারপর সে আপনা হইতেই আমার শিয়রে বসিয়া একে একে সব কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমার এত অধিক জ্বরে আমাকে এরূপ অচেতন অবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণাহোটেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা পাইবার জন্য আমার পকেট অনুসন্ধান করিয়া ওঙ্কারলাল চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের ঠিকানা পাইয়া তাঁহাকেই তার করিয়াছিল এবং তিনি কন্যাকে লইয়া অচিরে কৃষ্ণা হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চন্দ্রা পিতাকে কোনও নার্স রাখিতে না দিয়া নিজেই সমস্ত শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। এমন সময় চন্দ্রার পিতা আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনিও আমাকে জ্ঞানাবস্থা ফিরিয়া পাইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম চন্দ্রার দিবারাত্র শুশ্রূষার গুণেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। আমার তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না, তাই চন্দ্রাও তাহার পিতার দিকে করুণ নেত্রে তাকাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার চোখ হইতে দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ক্রমে ক্রমে আমি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলাম। বেশ একটু সারিয়া আসিলে চন্দ্রা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী লুকারগঞ্জে এলাহাবাদ ষ্টেসনের নিকটে। লুকারগঞ্জ রোডটি বেশ প্রশস্ত, দুই ধারে বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণী বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া একটা স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

একদিন আমি চন্দ্রা ও তাহার ছোট এক মামাত ভাই আমরা কয়জনে মিলিয়া খস্রুবাগে বেড়াইতে গেলাম। খস্রুবাগ লুকারগঞ্জের খুব নিকটে। এখানে খস্রু ও তাঁহার বেগমের এবং আরও কয়টি সমাধি রহিয়াছে। সমাধির চারিধারে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যে এখন সমস্ত সহরে—জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রকাণ্ড কল রহিয়াছে। আমরা ঐ জলের কল দেখিয়া সমাধিস্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম। কোন্ এক যুদ্ধে জাহাঙ্গীর তনয় খস্রু বিদ্রোহী হইয়া এখানে অন্তিম শয়নে শুইয়া আছে। আজ মনে পড়িয়া গেল মোগল বাদশাহদের সেই লোকাতীত ঐশ্বর্য্য, তাহা এখন কোন্ মায়াপুরীর খেলার মত অতীতের দর্পণ তলে, এখন শুধু ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল এই রকম কয়েকটি স্মৃতি তাহা কালের সর্ব্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে উপহাস করিয়া এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহাজাদা খস্রু ও তাঁহার বেগমের কবরের পাশে আর একটি কবর দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহা খস্রুর এক প্রিয়পাত্রী পানওয়ালীর কবর, একমাত্র ভালবাসার দাবীতে পানওয়ালী ঐখানে স্থান পাইয়াছে। শুনিয়া ঐ কবরের উপর গিয়া বসিতে ইচ্ছা করিল, সঙ্গে সঙ্গে খস্রুর উপর একটু শ্রদ্ধার ভাবই আসিল। এমনি আপনকরা ভাললাসা যা সামান্য পানওয়ালীকে একেবারে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছে তাহার চরণে মাথা নোয়াইতেই হয়। এমন আপনাভোলা প্রাণ-নিঙড়ান ভালবাসা কয়টা-লোকের ভাগ্যে ঘটে কে জানে, তাই ইহার সম্মানের জন্য আমরা ঐ কবরের পাশে আসিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল ; স্থানটি নির্জ্জন। এই নির্জ্জন পবিত্রস্থানে আমার বড় গান শুনিতে ইচ্ছা করিল। চন্দ্রাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে কয়েকবার আপত্তি করিয়া পরে স্বীকৃতা হইল। চন্দ্রার স্বর বড় মধুর, সে সেই মধুর স্বরে করুণকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল—

“সাচী-প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি
তুম্ সঙ্গ যোড়ি আওর সঙ্গ তোড়ি।
যো তুম্ বাদল তো হাম মৌ’রা,
যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জী চকোরা।

যো তুম্ দেওরা তো হাম্ বাতি,
যো তুম্ তীরথ তো হাম্ যাত্রী।
যাঁহা যাঁই তাঁহা তেরি হি সেবা,
তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।"

এই গানটি ভগবানের চরণে ভক্তের আত্মনিবেদন। ভক্ত বলিতেছে, ওগো তুমি আমার ইন্দু, আমি তোমার জ্যোৎস্নাভিখারী চকোর। এই প্রেমের পুণ্যতীর্থে এই নির্জ্জন উদ্যানের মাঝে প্রকৃতির মৌন সহানুভূতির মধ্যে সেই গানের রাগিণী আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের মণিকোঠায় থাকিয়া থাকিয়া বাজিতেছিল—"তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।"

(৩)

"সেদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে চন্দ্রার কয়েকটি ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে লইয়া চন্দ্রা আর আমি প্রয়াগে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এলাহাবাদ ফোর্টের নিকট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ধীর সমীরণে শান্ত নদীর বুকের উপর দিয়া তর্‌তর্ বেগে নৌকাখানি চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অস্তমান রবির কিরণ যমুনার কালো জলে পড়িয়া একটা কোমল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে যমুনার স্বচ্ছ নির্ম্মল কালো জল গঙ্গার শুভ্র অঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। শরতের নির্ম্মেঘ আকাশের তরল জ্যোৎস্না গঙ্গার বুকে চিক চিক করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটি গৌরবর্ণা তন্বী গুছাইয়া একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পড়িয়াছে। এই যমুনার সাথে কত গাঁথা কত গীতিকাব্য কত বাঁশরীর রাগিণী মিশাইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার সেই পরাণ পাগল-করা উদাস ভাবের মাঝে মনে হইতেছিল যেন কোন্ অদূর কুঞ্জভূমি হইতে শ্যামসুন্দরের গোপীমন-ভুলান বাঁশরীর ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। চন্দ্রা সাথে করিয়া একটি সেতার লইয়া আসিয়াছিল। ভাবমুগ্ধ হইয়া সে কখন উহার কাণ মোচড়াইয়া পর্দ্দায় অঙ্গুলি সংযোগ করিয়া একটা মধুর ঝঙ্কার দিল। সুর প্রথমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইলেও ক্রমে তাহা নব বধূর ঘোমটা ঢাকা মুখের মত সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। সুরের শান্ত কোমল উচ্ছ্বাস

তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল। আমি ভাবের আবেগে সেই সুরের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিলাম—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!
নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী জনক-জননী-জননী।
প্রথম প্রভাত তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া চন্দ্রা গানটি শুনিতে ছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আমি আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে গাহিয়া চলিলাম—

"নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণ তল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।"

গান থামিয়া গেল। অনেকক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিল, তারপর চন্দ্রা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—"কি সুন্দর কথাগুলি"! আমি বলিলাম এই সঙ্গীতটী আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা। পদলালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে এই গানটী বাঙ্গলা ভাষার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই যে আমাদের দেশ জননীর পবিত্রশ্রীর পরিচয় যার স্মৃতি মাত্রেই আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব গর্ব্বের ভাব জাগিয়া উঠে, আমরা কি তাহা ধারণ করিবার উপযুক্ত হইব না। কোন্ অপূর্ব্ব উষায় এই ভারতের তপোবনে সামঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল; কত জ্ঞানের বার্ত্তা ধর্ম্মের কথা এই আর্য্য ঋষিগণের আবাসভূমি হইতে প্রচারিত হইয়াছিল; নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে প্রভাসিত কত কাব্য দর্শন পৌরাণিক কাহিনী এই তুষারমৌলিহিমাচলরক্ষিত শতপুণ্যনদনদীবিধৌত আর্য্যভূমি হইতে বিঘোষিত হইয়াছিল। আমরা সেই ভারতে জন্মিয়া সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী পরের কথায় বিমুগ্ধ, নিজের নিজস্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না, আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমাদের যত্ন নাই। এইরূপ দেশের অনেক কথা চন্দ্রার সাথে আমার সেদিন হইয়াছিল। রাত্রি হইয়া আসিল আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(৪)

"পরদিন দেশ হইতে সংবাদ আসিল আমার মায়ের বড় অসুখ, শীঘ্রই আমার যাওয়া প্রয়োজন। সে দিনই চন্দ্রাদিগের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আজও মনে পড়ে চন্দ্রার সেই বিচ্ছেদকাতর মুখখানি যাহা আমার অন্তরের মাঝে মূর্ত্তি লইয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। দেশে আসিয়া দেখিলাম মায়ের আমার বড়ই অসুখ। প্রাণপণ যত্ন করিয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে মায়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চালাইতে লাগিলাম। প্রায় দশমাস ভুগিয়া আমার মায়া কাটাইয়া মা আমার স্বর্গে গমন করিলেন। মৃত্যু শয্যায় আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"বাবা, জীবনে চিরসুখী হও।" ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন —"হু"।

প্রায় একবৎসর উদাস ভাবে তীর্থে তীর্থে কাটাইয়া মনটা একটু শান্ত হইলে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিন মনের অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় চন্দ্রার কথা বড় মনে আসে নাই, কিন্তু আজ বাড়ী আসিয়া শুধু চন্দ্রার কথাই মনে হইতে লাগিল। কয়েকদিন এইরূপভাবে মনমরা থাকিয়া এলাহাবাদে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় আমার নামে একখানি পত্র আসিল। ডাক ঘরের ছাপ দেখিয়া বুঝিলাম চিঠিখানি এলাহাবাদ হইতে আসিতেছে। বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিলাম। সংবাদ পড়িয়া মাথা ঘুড়িয়া গেল, হাত হইতে চিঠিটা পড়িয়া গেল। এলাহাবাদ হইতে চন্দ্রার মামাত বোন লিখিয়াছে "সুশীল বাবু, আমাদের প্রিয় ভগিনী চন্দ্রা আজ চারিদিন হইল আমাদের সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ছয়মাস কাল তিনি ক্ষয় রোগে ভুগিতে ছিলেন, মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আপনার নামে একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন মৃত্যুর পরে ইহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতে। সেই কথা অনুসারে পত্রখানি আপনার কাছে পাঠাইলাম।" স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রার পত্রখানি তুলিয়া লইলাম। চন্দ্রা লিখিয়াছে—

"ওগো বন্ধু আমার,

মনে হয় আজ কত যুগ বুঝি কেটে গেছে আমাদের সেই—চিরমধুর মিলনের পরে। না, তর্ক করোনা, জানি তোমার তর্ক করবার একটা রোগ

আছে। তুমি বোধ হয় বুঝবে না সত্যি সত্যি একটা যেন যুগ কেটে গেছে। যাকে সামনে পেলে নিমেষে হারাই এমনতর ভয় সব সময়ে জেগে থাকৃত তাকে এতদিন না দেখে কেমন করে বেঁচে আছি আমিই বুঝতে পারিনি। মনে পড়ে কি তোমার কাছেই একদিন বিদ্যাপতির একটা পদ শুনেছিলাম, সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

আজ বুঝতে পারছি এ মস্ত একটা সত্যি কথা। হেসোনা, মনে ভাব্ছ চন্দ্রা কেমন করে এতবড় দার্শনিক হয়ে পড়ল। দার্শনিক কি লোকে কেবল বই পড়েই হবে, মনের মাঝখানে কতভাব কত নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্ছে। সেই সব রূপকে চিন্তে গেলেই ত মানুষ দার্শনিক হয়ে পড়ে। এতদিনের জমাট বাঁধা ব্যথা আজ আমায় এমন মুখরা করে দিয়েছে। তুমি ভাব্ছ এতদিন তবে কেমন করে তোমায় ভুলে ছিলাম। বন্ধু, ভুলতে তোমায় কখন পারিনি, পারতেও চাইনি। কতদিন তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি কিন্তু দুই ছত্র লিখেই লজ্জায় আর লিখ্তে পারি নি। দুছত্র লেখা চিঠিখানা অমনি ছিঁড়ে ফেলেছি। আজ আমার কিন্তু লজ্জার সকল বাঁধন টুটে গিয়েছে। জানি আমি আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আর তুমি যখন আমার এচিঠি পাবে তখন আমি অন্য লোকে। লজ্জায় আর আমার মৌন রাখতে পারবে না কারণ আজ আমি তোমার কাছে আমার প্রাণের কথা উজাড় করে দিয়ে যাব।

মনে পড়ে তোমার সেই ডিরি অনসনে থাকার কথা? তোমার সুন্দর সরল তেজস্বী কথাগুলি শুনতে শুনতে আমি তোমার মুখের পানে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকৃতাম। কি দীপ্ত সে মুখ কি স্বর্গীয় লাবণ্য সে মুখে খেলা করত। তুমি স্বভাবতঃ বড় বেশী কথা বলতে না কিন্তু তোমার কথাগুলি শুনতে আমার এমন ইচ্ছা হ'ত যে কোন বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধ মত বলে তোমার অনর্গল তর্কের ঝরণায় ডুবে থাকৃতাম। তুমি বুঝি ভাব্তে আমি তোমার কথাগুলি সব গিলে নিচ্ছি তোমার ভক্ত শিষ্য হব বলে। তোমার কথাগুলি গিলতাম নিশ্চয় কিন্তু সে যেমন দেবতারা সাগর মন্থনের পর অসুরের ভয়ে সুধা গিলেছিল। ভয় হত পাছে একটা কথাও হারিয়ে ফেলি। তারপর

যেদিন তুমি ডিরি অনসোন থেকে এলাহাবাদে চলে গেলে তখন আমার বুক ভেঙ্গে যেন কান্না বেরুচ্ছিল। জান্‌তাম আমরা ও শীঘ্রই এলাহাবাদে যাচ্ছি, তবু বিচ্ছেদটা আমার প্রাণে এমনি ভাবে বেজেছিল।

তারপর কৃষ্ণা হোটেলের ম্যানেজার যেদিন বাবার কাছে তার কর্‌লে আর আমরা তোমার ওখানে গিয়ে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম, সে দিন আমার মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগল আমি তোমায় সারিয়ে তুলবই। বন্ধু আজ আমার কোন ও সঙ্কোচ নেই, তাই তোমায় সব কথাই বল্‌তে পার্‌ছি। তোমার অসুখের মধ্যে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে চিকিৎসকের আশা পেয়ে বা নিরাশ ভাব দেখে কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তাম কখনও বা অবসাদে হৃদয় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে দিনরাত্রি বুক বেঁধে শুশ্রূষা করেছিলাম। ওঃ; সে দিন তোমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে আমার কি আনন্দই হয়েছিল।

সেদিন শরতের আকাশে জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেছিল। খোলা জানালা দিয়ে তোমার মুখের উপর আলোর ধারা খেলা করছিল। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তখন মহেন্দ্রযোগ না ঐ রকম একটা শুভলগ্ন; তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলে। আমি আমার আঙটিটা তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম, তোমার আঙটিটা খুলে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরে নিলাম। তারপর তোমার পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা নমস্কার করে ফেললাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌লাম এই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। তুমি হাস্‌ছ। কিন্তু জেনো ভগবান যেখানে পুরোহিত এবং আকাশের তারা যেখানে সাক্ষী তার চেয়ে খাঁটি বিয়ে আর হতে পারে না। প্রকৃত বিয়ে ত অন্তরে অন্তরে মিলন, জাত সম্বন্ধ বিচার করলে তার গৌরবটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। মন্ত্রপড়া ত একটা লৌকিক আচার মাত্র। যখন মনে মনে বিয়ে হয়ে গেল তখন কোন মন্ত্রটা পড়া হল কি না হল তা ভাববারই ত সময় থাকে না। প্রকৃতির মাঝেও ঠিক এমনি প্রেমের লীলা, দেখনি মাধবীলতা যখন সহকারতরুকে ঘিরে ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে গড়ে উঠে, তখন সে ভেবে দেখে না তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ কোনও লৌকিক নিয়মসিদ্ধ বা মন্ত্রানুমোদিত কি না।

তারপর তুমি তোমার মায়ের অসুখ শুনে চলে গেলে। পাছে তোমার যাত্রায় অশুভ হয় এই জন্য প্রাণপণে তোমার নিকট প্রফুল্লভাব দেখিয়ে এসেছি। কিন্তু যেমন বেশী আঘাত লাগলে একটা নীল কালশিরে দাগ হয়ে থাকে,

রক্তের লেশও পড়েনা, তেমনি এই আমার জমাটবাঁধা বেদনা এমনি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, যে তাতে বোধ হয় অশ্রুর উৎসের মুখে একটা পাথর চাপা পড়েছিল।

তোমার কি মনে পড়ে তোমার একখানি ফটো এলাহাবাদে চুরি গিয়েছিল। সে চোর আমিই। তোমার চলে আসার পর সেই ফটোখানি রোজ গোলাপ ফুলে সাজিয়ে রাখ্‌তুম কারণ জান্‌তাম তুমি গোলাপ ফুলই বেশী ভালবাস্‌তে। এখনো এই যে আমি তোমার কাছে চিঠিখানি লিখ্‌ছি তাতেও আমার সামনে তোমার ফটোখানি যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধু, আর আমি কি বল্‌ব, আমার কথা শেষ হয়ে এসেছে। বন্ধু, চল্‌লাম, বিবাহ ত আমাদের হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষায় রইলাম, জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার অপেক্ষায় থাকব। সাধনায় সিদ্ধি হবেই, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাব এই আশা দিয়ে বুক বেঁধে থাকব। বন্ধু, চল্‌লাম মিলনের পথ চেয়ে বসে থাকব। বিদায়, বন্ধু, বিদায়। চন্দ্রা।"

এইখানে সুশীলচন্দ্র তাহার জীবনের আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বলিলেন—"ওগো, আজ তোমরা আমার জীবনের কথা শুন্‌লে। জীবনে আমার সুখের উৎস—শুখিয়ে গিয়েছে। যার সাথে আমার এমনি পবিত্র মিলন হয়েছে তার সাথে আবার কবে মিল্‌ব তাই বসে বসে ভাবি। সেই মিলনেই হবে আমাদের ফুলশয্যা।" এই বলিয়া সুশীলচন্দ্র নীরব হইলেন। তখন রাত্রি অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। চিন্তান্বিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পথে কে যেন তখন গাহিয়া যাইতেছিল—

"মন-বুলবুলে তুলেছে রাগিণী
হৃদয় আমার মথিছে ধীরে;
গত জীবনের কত ভালবাসা
অবুঝ মানসে বিহরি ফিরে।"

নারায়ণের নিকষ-মণি

বেহার-চিত্র—শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রণীত। রায় চৌধুরী কোম্পানী কর্ত্তৃক ৬৮।৫ রসারোড নর্থ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১।০।

গ্রন্থকার কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—বেহারীচরিত্রের অসম্পূর্ণতাই

উহাদের উপকরণ। কিন্তু গ্রন্থকার বেহারীর যে সকল অসম্পূর্ণতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সকল প্রদেশীর চরিত্রে বর্ত্তমান্ আছে। জানিনা ভারতের কোন প্রদেশে "মেহেরবান্‌খাঁ" ও "হরসুখরায়" প্রভৃতির ন্যায় "জো হুজুর" লোকের অভাব আছে।

চিত্রগুলি বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে—হাস্যরসে আবরিত হইয়াছে বলিয়া চিনি মণ্ডিত কুইনাইনের কার্য্য করিয়াছে। এক্ষণে ব্যাধি সারিলেই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম দুইটি চিত্রে বেহারীচরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখাইতে গিয়া ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, লেখকমহাশয় ভারতশাসনের গুপ্ত রহস্য উৎঘাটন করিয়া ফেলিয়াছেন—যিনি ইমান্ খোয়াইয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন, তিনিই কর্ত্তাদের চক্ষে "ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে প্রকার লোকের আবশ্যক তাহাদের আদর্শ হইবার উপযুক্ত" যাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রতি-মুহূর্ত্তের প্রবঞ্চনার নব নব উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত তিনিই সেলামের জোরে "রায় সাহেব" খেতাবে ভূষিত: আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই বলা হইতেছে, "আপনার দেশ প্রসিদ্ধ সাধুতা, বদান্যতা ও প্রজাপ্রিয়তায় গভর্ণমেণ্ট মুগ্ধ"। উহাদের মধ্যে কতটা সত্য লুকান আছে গ্রন্থকারই জানেন।

কেবল বেহারবাসীর "অন্ধকার অংশ" আঁকা হইয়াছে এই অনুযোগের উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি বন্ধুভাবেই এই রূপ করিয়াছেন কেননা—এই সকল অসম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া তাঁহারা কল্যাণলাভ করুন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা—কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু আমাদের এই স্থানে বক্তব্য যে পুস্তকখানি অতি অল্পবেহারীই পড়িবে। সুতরাং কেবল dark side আঁকিয়া চিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়া লাভ কি ?

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, কলেজষ্ট্রীট্, মার্কেট, ইণ্ডিয়ানবুক্‌ক্লাব হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০। বোলসেভিক্‌নেতা :লেনিনের ক্ষুদ্রজীবনী। বইখানি ছোটর উপর বেশ শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] [পৌষ, ১৩২৮।

স্বরাজ্য-সাধনা

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।—শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত।

যুগান্তর পরে আজি বিজয়-দুন্দুভি বাজি'
রোমাঞ্চ সঞ্চারে এহি বঙ্গের শ্মশানে।
জাগিল রে সুপ্ত জাতি জ্বলন্ত উৎসাহে:মাতি,'
উদ্যমে, আশায় দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ পরাণে।
সর্ব্ব ভেদাভেদ ভুলি' ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি ;
উচ্চ-নীচ নাহি আর ;—প্রেমে একাকার!
চৈতন্যচন্দ্রের বঙ্গে প্রমত্ত তরঙ্গ ভঙ্গে
দিব্য চৈতন্যের বন্যা বহিল আবার!
উত্তাল তটিনী ধায়, দ্বেষ-হিংসা ভেসে যায়,
ধন্য সবে তাহে এবে করি' শুচিস্নান।
কত জন্ম জন্ম পরে আজিরে বিধির বরে
স্বার্থ পরার্থেরে করে বরমাল্য দান!

* * *

একতা-পতাকা মূলে মিলি' সবে, কণ্ঠ খুলে'
গাহ,—"জয় জগদীশ শঙ্কাভয়হারী!